চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা ঃ লোক সংস্কৃতির নানা উপাদান

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৭টি খণ্ডের ৪৮টি পালায় লোকসংস্কৃতির নানাবিধ উপাদানগুলির মধ্যে (ক) লোকসঙ্গীত, (খ) লোকক্রীড়া, (গ) লোকশিল্প, (ঘ) লোকবৃত্তি, (ঙ) লোকপোষাক, (চ) লোকখাদ্য, (ছ) লোকসম্প্রদায়, (জ) লোকবাদ্য, (ঝ) লোকদেবতা (ঞ) লোকপ্রবাদ ও (ট) লোকাচার এই ১১টি উপাদান কোন প্রসঙ্গে কোন পালায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে আলোচ্য উপাদানগুলির উপযোগিতাই বা কতখানি সে বিষয় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হল।

(ক) লোক সঙ্গীত

প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূলে আনবার জন্য মেহনতি সংগ্রামী মানুষ যে শ্রমদান করেছে সেই শ্রমপ্রক্রিয়ার বিশেষ স্তরে লোক-সঙ্গীতের জন্ম। আদিম লোকসমাজে মানুষ তার কর্মে উদ্দীপনা বা কর্মে উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র অবলম্বন হিসাবে সঙ্গীতকেই বেছে নিয়েছিল। সেই হিসাবে লোকসঙ্গীতের সাঙ্গীতিক প্রয়াসকে মেহনতি সংগ্রামী মানুষের জীবন বিকাশের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার অব্যর্থ হাতিয়ার বললে অত্যুক্তি হবে না। এই প্রসঙ্গে *Frederick Engles* এর মন্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য -

> *"First labour, after it, and then with it, articulate speech - these were the two most essential stimuli under the influence of which the brain of the ape gradually changed into that of man, which for all its similarity to the former is far larger and more perfect. Hand in hand with the development of the brain went the development of its most immediate instruments the sense organs ..... The reaction on labour and speech of the development of the brain and its attendant senses, of the increasing clarity of consiousness, power of abstraction and of judgement, gave an ever-renewed impulse to the further development of both labour and speech."*[৩]

সঙ্গীত শ্রুতিসাপেক্ষ সুর ও ছন্দ নির্ভর শিল্প। সমাজবদ্ধ মানুষের গানে শ্রমজাত আনন্দ সামাজিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে মেহনতি মানুষের গানে শ্রমধ্বনির অস্তিত্ব ছিল। প্রাক-ঐতিহাসিক যুগে আদিম মানুষ যেমন পাথর ভাঙার তালে তালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান গাইত, তেমনি বর্তমান কালেও মানুষ অগভীর টিউবওয়েল বসানোর সময় পাইপ বসানোর তালে তালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান গায়। এই পাথর বসানোর কাজ করতে বা পাথর ভাঙার কাজ করতে শ্রমিককে যে কী শ্রম দিতে হয়, গানের মাধ্যমে তারা অপেক্ষাকৃত কম আয়াসে আনন্দের সঙ্গে কাজটি সমাধান করতে পারে।

সঙ্গীতের আদিম পর্যায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে ভারতবর্ষের একাধিক উপনিষদ্ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। আদিম মানুষের কামনা ছিল দুটি - শস্য কামনা ও সন্তান কামনা। এই দুই কামনাকে সফল করবার তাগিদে আদিম মানুষের যাবতীয় সঙ্গীতের প্রয়াস। বিভিন্ন উপনিষদে শস্য কামনা তথা অন্ন কামনা ও গান অবিচ্ছেদ্য ছিল। এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১.৩.১৮ নং শ্লোকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। -

"তে দেবা অব্রুবন্নেতাবদ্ধা ইদংসর্বং যদন্নং তদাত্মন - আগাসীরণু নোহস্মিন্নন্ন আভজস্বেতি ...।"[২]

আলোচ্য শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ করলে হয় - (সেই দেবতারা বললেন, এতাবৎ যাবতীয় অন্ন গানের দ্বারাই নিজের জন্য লাভ করেছ। এখন আমাদের সে অন্নের অংশ ভাগ কর।)

লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে দলে আবদ্ধ মেহনতি মানুষের লোকায়ত ভাব-ভাবনা ও জীবন বৃত্তের সাঙ্গীতিক প্রকাশ ঘটে। সঙ্গীতের অভিপ্রায় হল মেহনতি মানুষকে সংহত করা। লোকসঙ্গীতের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে সমগ্র সমাজের ঐক্যবদ্ধ সক্রিয়তা। সমাজবিকাশের এই পর্বে লোকসঙ্গীত, উৎপাদনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে *Thomson* -এর একটি মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য -

> *"The three arts of dancing, music and poetry began as one. Their source was the rhythmical movement of the human bodies engaged in collective labour."*[৩]

লোকসঙ্গীতের প্রথম প্রকাশ ঘটে লোক ঐতিহ্যে বিশ্বাসী নিরক্ষর মেহনতি মানুষের কণ্ঠে। কৃষিনির্ভর সমাজের মানুষই লোকসঙ্গীতের স্রষ্টা। তবে লোকসঙ্গীতের উৎস অনুসন্ধান করতে হলে যেখানে একদিন জীবনের প্রয়োজনে সঙ্গীতের উদ্ভব হয়েছিল, সেই আদিম সমাজে পিছিয়ে যেতে হবে। সেই আদিম সঙ্গীত হল অধুনাতন লোকসঙ্গীতের জননী। আদিম সঙ্গীতের মতো লোকসঙ্গীত গ্রামীন জনসমাজের অপরিহার্য উপাদান। জনসমাজের কঠিন - কঠোর মৃত্তিকায় এর জন্ম। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে লোকসঙ্গীত জন্মলাভ করে নিরক্ষর রচয়িতা - গায়কদের মুখে মুখে পুরুষানুক্রমে বাহিত হয়ে চলে। আর একারণে লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া লোকসঙ্গীত কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানে শেখানো গান নয়। এই সঙ্গীত শ্রুতির মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রাখতে হয়। *'Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend'* গ্রন্থে বলা হয়েছে -

> *"They are learned by ear and transmitted in this fashion from generation to generation is there a conscious awareness of from construction on the part of a folksinger."*[৪]

একথা মনে রাখতে হবে যে, বংশপরম্পরায় প্রবহমান লোকসঙ্গীতের উন্নতি - অবনতি দুইই ঘটতে পারে। লোকসঙ্গীত যেমন নতুন যুগকে স্পর্শ করে, তেমনি নতুন নতুন উপকরণ সংগ্রহের মাধ্যমে নিজের শক্তিকে সুদৃঢ় করে। এ প্রসঙ্গে *R. V. William* তার *Folksong, Encyclopaedia Britanica* গ্রন্থে বলেছেন -

> *"A Folksong is neither new nor old, it is type a forest tree with roots deeply buried in the past but which continiously puts forth new branches new leaves new fruits."*[৫]

লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে *'International Folk - Music Council'* লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন -

> *"Folk-music is the product of a musical tradition that hasbeen evolved through the process of oral transmission. The factors that shape the tradition are: i.continuity which links the present with the past. ii. variation which springs from the creative im-pulse of the individual or the community, which determines the*

form or forms in which the music survives."[৫]

লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন -

"যাহা একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত তাহাই লোকসঙ্গীত।"[৭]

সুতরাং ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতো লোকসঙ্গীতের প্রচারই মুখ্য বিষয়, উৎস গৌন। এই প্রচার মুখ্যতা প্রসঙ্গে George Herzog তাঁর গ্রন্থে বলেছেন -

"Folksong are best defined as songs which are current in the repertory of a Folk group, the Study of their origin is another matter."[৮]

তবে লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে সাধনময় ভট্টাচার্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে -

"লোকসঙ্গীত হল লোকসমাজ কর্তৃক মুখে মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি ও সুর সহযোগে গীত; সাধারণত কর্ম, প্রেম ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত একজাতীয় গান, যা স্মৃতির মাধ্যমে বাহিত বলিষ্ঠ জীবনচেতনা ও সুরের ও গায়নরীতির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে জীবনমুখী।"[৯]

লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের মধ্যে বহু প্রচলিত ও বহু প্রচারিত জনপ্রিয় শ্রুতি - স্মৃতি নির্ভর মৌখিক রচনা হল লোকসঙ্গীত। বিভিন্ন ধরণের লোকসঙ্গীতগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় -

১. **আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতঃ**

ভোটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, আলকাপ, পটুয়া, করম, টুসু-ভাদু, মুণ্ডারিগীত সারি, জারি। ঝুমুর, ভাদুরিয়া, গাজন, বাইচ, জাগ প্রভৃতি।

২. **আনুষ্ঠানিক ও পূজাপার্বন বিষয়ক লোকসঙ্গীতঃ**

মনসা, শীতলা, রাসলীলা, জন্মাষ্টমী, হোলি, বোলান, পৌষপার্বন, ভাইফোঁটা, নীলগাজন প্রভৃতি।

৩. **প্রেমমূলক লোকসঙ্গীতঃ**

রাধা-কৃষ্ণ, সীতা ও রাধার বারমাস্যা এছাড়া পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী নির্ভর প্রেমগীতি প্রচলিত।

৪. **কর্মসঙ্গীতঃ**

গাড়িয়াল, মইযাল, বীজবোনা, ধানভানা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে এই লোকসঙ্গীত রচিত হয়। এছাড়া কৃষি, চাষবাষ, নৌকা চালানো, ছাদ পিটানো ইত্যাদি কাজের সূত্রে এই প্রকার লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে।

৫. **তত্ত্বগীতিঃ**

কীর্তন, বাউলসঙ্গীত, মুর্ষিদী, দেহতত্ত্ব, মারফতী প্রভৃতি লোকসঙ্গীত।

৬. **সমাজ ইতিহাস বিষয়ক, নৈসর্গিক, সম্প্রদায়গত, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ক লোকসঙ্গীতঃ**

ধামালী, পাঁচালী, সঙ, ঝাঁপান প্রভৃতি।

লোকসমাজের ক্রমোন্নতি এবং ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লোকসঙ্গীতের সুর ও বাণীর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তবে লোকসঙ্গীতে দেশজ মেঠো সুরের একটি স্বতন্ত্র গায়কী রীতি থাকে। একই সুরের পুনরাবৃত্তি লোকসঙ্গীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। লোকসঙ্গীতে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে সাধারণত - একতারা, দোতারা, বাঁশি, সারিন্দা, ঢোল, করতাল, খঞ্জনি, কাঁসি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। তবে প্রত্যেক লোকসঙ্গীতের নির্দিষ্ট একটি সুর থাকে। এই বিশেষ সুরের ব্যতিক্রম ঘটলে কোনো লোকসঙ্গীতই প্রতিষ্ঠা পায় না। এ প্রসঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন -

> *"বিশেষ কোনো গীতির মধ্যে বিশেষ সুর অপরিহার্য হইবার যে ঐতিহাসিক কারণ থাকে, তাহা অনেকসময় উপর হইতে বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া এই অপরিহার্যতার কোন ও কারণ নির্দেশ করিতে পারা যায় না। কোন্ সুর যে কোথায় সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা সহজে বলিতে পারা যায় না। ... এক বা একাধিক সুর এক একটি বিস্তৃত জাতির নিজস্ব দান - জাতির পরিচয় লুপ্ত হইয়াছে ... কেবল সুরটুকুই অবিনাশী হইয়া যুগ হইতে নতুন যুগের দ্বারদেশে উত্তীর্ণ হইতেছে।"*[১০]

লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে একদিকে যেমন আশা - আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে তেমনি রূপকের আড়ালে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বণিত হয়েছে। আর একারণে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শাসক গোষ্ঠী আত্মস্বার্থ সিদ্ধির জন্য লোকসঙ্গীতের অগ্রগতিকে অবরুদ্ধ করবার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু সে স্বপ্ন অন্তঃসারশূন্য। লোকসঙ্গীত মানব সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারাপথে অনশ্বর আয়ুর অধিকারী। জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে লোকসঙ্গীতের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবেশনে সচেতন হওয়া আমাদের জাতীয় কর্তব্য। আধুনিক কালে নানাবিধ জাতীয় সংকট, সামাজিক - রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক সমস্যা, লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অধুনা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবসাধনে সমর্পিত প্রাণ জনগণের কণ্ঠ থেকে লোকসঙ্গীত নিঃসৃত হয়। সেকারণে সমাজব্যবস্থার মর্মকথা লোকসঙ্গীতে সর্বথা প্রকাশমান। আর এই হিসাবে লোকসঙ্গীতকে গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পসৃষ্টি বললে অত্যুক্তি হয় না।

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সাতটি খণ্ডের বিভিন্ন পালায় কিভাবে লোকসঙ্গীতের প্রসঙ্গ এসেছে নিম্নে তা আলোচনা করা হল।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডের প্রথম পালা 'বাইদ্যা কন্য মহুয়া' পালায় হুমরা বেদে তার দলবল নিয়ে নদ্যার চাঁদের বাড়িতে খেলা দেখাতে আসে। হুমরা বেদের একটি উক্তিতে নদ্যার চাঁদের বাড়িতে লোকসঙ্গীত পরিবেশনের উল্লেখ আছে -

> *"গাহান্ করতে আইলাম আমরা নদ্যাঠাকুরের বাড়ী।"*[১১]

আবার এই পালার একেবারে শেষ অংশে মহুয়ার আত্মহত্যা ও বেদের দলের হাতে নদ্যার ঠাকুরের মৃত্যুর পর হুমরা বেদের নির্দেশে তাদের দুজনকে একই কবরে মাটি চাপা দেওয়া হয়। এরপর বেদের দলের সকলে চলে গেলেও মহুয়ার প্রিয় সাথী পালংসই এই বনে থেকে যায়। পালা রচয়িতা দ্বিজ কানাই পালংসই সম্পর্কে বলেছেন -

> ''আইধ্বল ভইরা বনের ফুল কন্যা তুইল্যা আনে।
> মনের গান গায় কন্যা বইস্যা সেই না বনে।।"[১২]

পালংসই বন থেকে ফুল সংগ্রহ করে কবরের উপর ছড়িয়ে দিয়ে যে মনের গান গায় তা আসলে লোকসঙ্গীতেরই

নামান্তর।

এই খণ্ডের 'সুন্দরী মলুয়া' পালায় জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষের সময় পালার নায়ক চান্দবিনোদ অত্যন্ত কষ্টে দিন কাটাতে থাকে। অজ্ঞাত পালা রচয়িতার লেখনী থেকে আমরা জানতে পারি, মাঠে যাওয়ার সময় চান্দ বিনোদ বারোমাসী গাইতে থাকে। এই বারোমাসী আসলে বিরহ সূচক গান যা লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভূক্ত -

"মাঠের পানে যায় বিনোদ বারোমাসী গাইয়া"[১৩]

এই খণ্ডের নয়ান চাঁদ ঘোষ বিরচিত 'চন্দ্রাবতী' পালায় চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করার জন্য জয়ানন্দ ঘটক পাঠালে, পাত্রের বিবরণ শুনে চন্দ্রাবতীর পিতা বংশীদাস জয়ানন্দের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবে বলে মনস্থির করল। এরপর পানের খিলি দিয়ে সম্মতি জানিয়ে ঘটক বিদায় করা হয়। এসময় পাড়ার নারীরা পানের খিলি বানাতে বানাতে বিবাহের মঙ্গলসূচক গান করতে থাকে। এই বিবাহের গান আসলে সমবেত কণ্ঠে লোকসঙ্গীত -

"যতেক নারীতে মিলি বিয়ার গান গায়।"[১৪]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের 'দেওয়ান মদিনা' বা 'আলাল দুলালের' পালায় কঠিন পীড়ায় স্ত্রীর মৃত্যুর পর দুই পুত্র আলাল ও দুলালকে নিয়ে দেওয়ান সোনাফর অত্যন্ত দুঃখ কষ্টে দিন কাটাতে থাকে। দুই পুত্রের কথা ভেবে দেওয়ান আর বিবাহ করবে না স্থির করে। কিন্তু উজীর নাজীরদের অনুরোধে সংসার রক্ষার জন্য দেওয়ান বিবাহ করতে বাধ্য হয়। নতুন স্ত্রী এসে সতীন পুত্রদের অত্যন্ত ভালোবেসে দেওয়ানের মন জয় করে পুত্রদের নিজের কাছে রাখার অনুমতি আদায় করে নেয়। এরপর কিভাবে সতীন পুত্রদের বিনাশ করা যায় সেই চিন্তা করতে থাকে। এরপর এক জল্লাদের সঙ্গে ফন্দী করে আলাল দুলালকে গভীর সমুদ্রে ডুবিয়ে মারার উদ্দেশ্যে সুসজ্জিত দৌড়ের নাও এ তুলে ভ্রমণ করতে পাঠায়। এই নৌকার মাঝিরা সারিগান গাইতে গাইতে এবং বৈঠার তালে তালে বাজনা বাজাতে বাজাতে আলাল দুলালকে নিয়ে রওনা হয়। নতুন স্ত্রী, সতীন পুত্র আলাল ও দুলাল কে উদ্দেশ্য করে বলে -

"দৌড়ের নাও বাইচ দিব সারি গাহান গাইয়া।
ঝামুর ঝুমুর ঘুঙরা বাজব বৈডার তাল ধইরা।"[১৫]

নৌকার মাঝিদের দ্বারা গীত এই সারিগান আসলে নদীর গান যা লোকসঙ্গীতের আঞ্চলিক রূপ বিশেষ। আবার এই পালার অন্যত্র নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অবশেষে দেওয়ান সেকেন্দারের সহায়তায় আলাল তার পিতার রাজ্য বান্যাচঙ্গ এর দেওয়ান হয়। দেওয়ান হওয়ার পর আলাল তার ভাই দুলালের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। নদী-নালা, বন-জঙ্গল পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে আলাল একটি বটগাছের নিচে বসে বিশ্রাম নিতে থাকে। এই সময় আলাল, রাখালগণের কণ্ঠে তার জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা সম্বলিত গান শুনে চমকে ওঠে এবং রাখালগণের কাছ থেকে ভাই দুলালের সন্ধান পায় -

"পরেত রাখুয়াল সগলে গাহান্ জুড়িল।
সেইনা গাহান শুইন্যা আলালের চমক লাগিল।"[১৬]

এই রাখালিয়া লোকগীতি আসলে লোকসঙ্গীতেরই অংশবিশেষ।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডের 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন কঙ্ক গর্গপুরে গর্গের টোলে আশ্রয় লাভ করে। সেখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গর্গের কাছে কঙ্ক একদিকে যেমন পুরাণ, সংহিতা, অলংকার শাস্ত্র ও ব্যাকরণ শিক্ষা গ্রহণ করে, তেমনি অন্যদিকে সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করে -

"ফেরুসাই বারোমাসী সঙ্গীত যে কত
শিখিয়াছে কঙ্কধর গান শত শত।।"[১৭]

আলোচ্য পঙক্তিতে উল্লিখিত ফেরুসাই আসলে বৈঠকী গান। আবার ভাটিয়ালী গানের একটি সুরের নাম ফেরুসাই। আর বারোমাসী হল বারোমাসের বিরহ সূচক গান। এই সমস্ত গান আসলে লোকসঙ্গীত বিশেষ। আবার এই পালার অন্যত্র কঙ্কের ভাটিয়ালী সঙ্গীত চর্চার প্রসঙ্গ আছে। পালা রচয়িতাগণ বলেছেন -

"ভাটিয়ালী গানেতে তার ঝরে বৃক্ষের পাতা।
একমনে শুন কই কঙ্কের বাঁশির বারতা।।"[১৮]

মনে রাখতে হবে যে, ভাটিয়ালী নদীমাতৃক বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের মূল সুর। ভাটিয়ালী চড়া সুরে শুরু হয়, এবং পরে ধীর মন্দাক্রমে বা দ্রুত ছন্দে নীচের স্বরে নেমে আসে। এরপর কঙ্কের মধুর সঙ্গীত শুনে এক পীরসাহেব মোহিত হয়ে তাকে শিষ্য করবার বাসনায় ডেকে আনে। এসময় -

"পীরের নিকটে বসি 'মলয়ার বারোমাসী'
যবে কঙ্ক মধুরে গাইল।
আহা কিবা মনোহর অশ্রু বহে দরদর
শুইন্যা পীর মোহিত হইল।"[১৯]

'মলয়ার বারোমাসী' হল একটি বিয়োগান্ত পালাগান। মলয়ার বারোমাসের বিরহসূচক গান 'মলয়ার বারোমাসী' আসলে ভাটিয়ালী গান - যা লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভূক্ত।

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'ভেলুয়া সুন্দরী-আমির সাধু' পালায় বোনের চক্রান্তে ও মায়ের আদেশে আমির সাধু বাণিজ্য যাত্রা করলে ভেলুয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করে। কিন্তু চারদিন পর আমির সাধুর নৌকা আবার তার নিজের বাড়ির ঘাটে এসে উপস্থিত হয়। তখন গভীর রাতে আমির সাধু ভেলুয়ার সঙ্গে দেখা করে এবং ভোর হওয়ার অনেক আগেই চলে গিয়ে পুনরায় বাণিজ্য যাত্রা করে। এদিকে আমির সাধু চলে যাওয়ার পর ভেলুয়া দরজা বন্ধ না করে অচৈতন্য হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে উঠে ননদ বিভলা, ভেলুয়াকে কলঙ্কিনী প্রতিপন্ন করল। আমির সাধু বাড়িতে এসেছিল - কিন্তু ভেলুয়ার এই কথা কেউ বিশ্বাস করল না। এরপর ভেলুয়ার শাশুড়ী ভেলুয়াকে বাহির বাড়ির কাজের দাসী করে রাখল। এসময় অসহায় ভেলুয়ার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে পালা রচয়িতা বলেছেন -

"দিবা নিশি কাঁদে কইন্যা দানা নাহি খায়।
বিরহে তাপিত হইয়া বারোমাসী গায়।"[২০]

ভেলুয়ার বারোমাসের বিরহসূচক গান বারোমাসী আসলে নারী জীবনাশ্রিত কাহিনীমূলক লোকসঙ্গীত। এরপর পালার পরবর্তী অংশে দেখা যায় দুর্জন ভোলা ভেলুয়াকে জোর করে চুরি করে নিয়ে আসে। বাণিজ্য করে বহু ধন সম্পদ নিয়ে বাড়ি ফিরে ভেলুয়াকে না দেখতে পেয়ে আমির সাধু ফকির বেশে ভেলুয়ার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। অবশেষে ভেলুয়ার সন্ধান পায়। এরপর মুনাপ কাজী ও ভোলাকে যুদ্ধে পরাজিত করে আমির সাধু ভেলুয়াকে উদ্ধার করে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই খবর পেয়ে পাড়ার সধবা-বিধবা নারীগণ ভেলুয়াকে দেখবার জন্য আমির সাধুর বাড়িতে উপস্থিত হয়। এই নারীগণের মধ্যে কেউ উলুধ্বনি করছে আবার কেউ হাঁহলা গাইছে -

"হাঁহলা গাহিছে কেহ কেহ দেয় জোকার।
ঘাটে বাজে ঢাক ঢোল নহবত আর।"[২১]

এই হাঁহলা গান আসলে নায়ক নায়িকার মিলন সঙ্গীত। পূর্ববঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিবাহ বাসরে মহিলারা এই গান গাইত।

এই খণ্ডের 'কমলা কন্যা'র পালায় কারকুনকে বিবাহ করতে অস্বীকার করার কারণে কমলাকে দুর্বিষহ দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়েছে। কারকুনের চক্রান্তে কমলার পিতা ও ভাইকে জমিদার বন্দী করেছে। কমলাকে হতে হয়েছে দেশান্তরী। একদিন কুড়া শিকার করতে গিয়ে জমিদার পুত্র প্রদীপ কুমার কমলাকে দেখে তাকে বিবাহ করার বাসনায় রাজবাড়িতে নিয়ে আসে। এই রাজবাড়িতে কারকুনের মিথ্যা চক্রান্তে বন্দী হয়ে আছে কমলার পিতা ও ভাই। প্রদীপ কুমারের অবর্তমানে কন্যা কমলা মনের দুঃখে মনের গান গায় -

"কুমার না থাকিলে কাছে কন্যা আপন মনে।
মনের গান গায় একেলা কেউ না সে শুনে।।"[২২]

কমলার এই মনের গান আসলে বিরহ সঙ্গীত। এই বিরহ সঙ্গীত আসলে লোকসঙ্গীতেরই অন্তর্ভূক্ত। 'কমলা কন্যা' পালায় গায়েনের বন্দনা অংশে 'কমলার বারোমাসী' গাওয়ার উল্লেখ আছে। আবার পালার সমাপ্তি অংশে পালা, রচয়িতা দ্বিজ ঈশান, গায়েনের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন -

"এইখানে করিলাম শেষ বারোমাসী গান।"[২৩]

কমলার বারোমাসের বিবাহসূচক বারোমাসী গান আসলে লোকসঙ্গীত বিশেষ। তবে উদ্ভবের দিক থেকে দেখলে বারোমাসী গান একধরণের আচারমূলক গান - যা পূর্ববঙ্গের পালাগুলির সাধারণ পরিচয়।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডের 'রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই' পালায় রঙ্গমালা সুন্দরীর খবর এনে দেওয়ার জন্য রাজচন্দর, শ্যামপ্রিয়া বোষ্টমীকে টাকা ও জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। রঙ্গমালা সুন্দরীর মনের অবস্থা জানতে এবং সুযোগ মতো রাজচন্দর যে তাকে ভালোবাসে সেকথা বলতে বোষ্টমী ছদ্মবেশে খঞ্জনি বাজাতে বাজাতে রঙ্গমালার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে গান গেয়ে বোষ্টমী সকলকে সন্তুষ্ট করে। অজ্ঞাত পালা রচয়িতার ভাষায় -

"খুঞ্জুনি বাজাই বোষ্টমী ধইরল একখান গীত।
শুনি যত নরের বংশ পাইল বড়ো প্রীত।।"[২৪]

বোষ্টমীর এই গীত আসলে লোকসঙ্গীত বিশেষ। এই খণ্ডের অন্তর্গত 'মানিক তারা ডাকাইত' পালায় বাসু নাপিতের সঙ্গে সাধুশীলের কন্যা মানিক তারার বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিষয়ে পালা রচয়িতা শেখ আমিরউদ্দিন বিবাহের গানের কথা বলেছেন -

"বিয়ার রাইতে তিন বউ আর পাড়ার যত মাইয়া।
মনের মতন কইরল আমোদ বিয়ার গান গাইয়া।"[২৫]

বিবাহ উপলক্ষে গান গাইবার রীতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। এই 'বিয়ার গান' আসলে সমবেত কণ্ঠে লোকসঙ্গীত। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব পরিবেশ ও প্রতিবেশের কথা দিয়ে বিবাহ সঙ্গীত রচিত হয়।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পঞ্চম খণ্ডের 'কমল সদাইগর' পালায় কমল সদাইগর, স্ত্রী সুরঙ্গিনীর মৃত্যুর পর মাতৃহারা দুই পুত্র চান্দমনি ও সূর্যমনির দেখাশুনার জন্য সোনাইকে পুনরায় বিবাহ করেন। দুইপুত্রকে দেখাশুনা করত বাড়ির প্রধান দাসী মইফুলা। এরপর কমল সদাইগর বাণিজ্যে গেলে, সোনাই সতীন পুত্রদেরকে হত্যা করতে চাইলে, মইফুলা তাদেরকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। ভাগ্যের পরিহাসে চান্দমনি রাজদরিয়া নগরের

রাজা হয় এবং সুর্যমনি ও পিতার সন্ধান পায়। সোনাইকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে তারা মইফুলা দাসীর খোঁজ করতে থাকে। হঠাৎ একদিন তারা এক পাগলিনীকে কাঁদতে কাঁদতে বারোমাসী গান গাইতে দেখে। অজ্ঞাত পালা রচয়িতার ভাষায় -

"একদিন পাগলিনী রাজার অন্দরে আসি।
কান্দিতে কান্দিতে গাইল সতাইর বারোমাসী।।"[২৬]

এই পাগলিনীর গানের কথা শুনে চান্দমনি ও সূর্যমনি - দুইভাই তাদের মইফুলা মাসীকে চিনতে পারল। বারোমাসী মূলত নারী ভাবনাশ্রিত কাহিনীমূলক লোকসঙ্গীত। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রাদেশিক লোকসাহিত্যে বারোমাসী গানের অস্তিত্ব বর্তমান। আলোচ্য পঙ্‌ক্তিতে উল্লিখিত সতাইর বারোমাসী আসলে সতীনের বারোমাসের বিরহ সূচক গান যা লোকসঙ্গীতের অংশ বিশেষ।

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'কবরের কান্না' পালায় বাণিজ্য করে ফিরবার সময় নুরুন্নেছা ও মালেক হার্মাদ ডাকাতদের দ্বারা আক্রান্ত হবার পর, ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গধু (বৃক্ষ) নৌকায় করে বহুমালপত্র ও শুকনো মাছ নিয়ে গভীর সমুদ্র পাড়ি দেয়। এই সময় নৌকার মাঝি মাল্লারা কেউ গানে ধূয়া গায় আবার কেউবা সারি গান গাইতে থাকে। অজ্ঞাত কবির ভাষায় -

"বেবান সাইগর সেই বড়ো বিষমপাড়ি।
কেহ ধরে গানের ধোসা কেহ গায় সারি।।"[২৭]

আলোচ্য পঙ্‌ক্তিতে উল্লিখিত সারিগান, মূলতঃ নদীর গান। বাইচের সময় অথবা গভীর সমুদ্রপাড়ি দেওয়ার সময় মাঝির দল বৈঠা ফেলার তালে তালে এই গান গেয়ে থাকেন। লোকসঙ্গীতের এই বিশেষ পর্যায় সারিগানের ব্যাপক চর্চা লক্ষিত হয় রাজসাহী, দিনাজপুর, ঢাকা, মৈমনসিংহ, বরিশাল, প্রভৃতি অঞ্চলে। এই পালার অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা মাঝিমাল্লাদের দ্বারা গীত বাইচার গানের উল্লেখ করেছেন -

"পর্চিম সাইগরের মাঝে উজান ভাড়ি বাইয়া।
মাঝিমাল্লা যায়রে সদাই বাইছার গান গাইয়া।।"[২৮]

'বাইচ' শব্দের অর্থ খেলা বা প্রতিযোগিতা। নদীমাতৃক বাংলাদেশে সেকালের মাঝি মাল্লারা রীতিমতো পাল্লা দিয়ে নৌকা চালনা করতেন। মাঝিমাল্লারা হার্মাদদের ভয়ে ভীত হয়ে পশ্চিমসাগর অতিক্রম করবার সময় এত দ্রুত বৈঠা চালনা করেছে এবং সেইমতো দ্রুত লয়ে গান গেয়েছে। যার বর্ণনা দিতে গিয়ে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা নৌকা বাইচের প্রসঙ্গ তুলেছেন। এই বাইছার গান বা বাইচের গান আসলে লোকসঙ্গীতের বিশেষ পর্যায় সারিগনের অন্তর্ভূক্ত।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সপ্তম খণ্ডের ''বাল্যস্মৃতি স্মরণে উদ্‌বাস্তুর কান্না'' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা দেখিয়েছেন যে, মাঝি মাল্লারা সারি গান গাইত এবং চাষীরা মাঠে বারোমাসি গাইত। পালা রচয়িতা দেখিয়েছেন -

"নায়ে গাইত সারিগণ
মাঠে চাষা বারোমাসি।
আইজও আমার কানে আইসে
সেই না সুর ভাসি।।"[২৯]

আলোচ্য পঙ্‌ক্তিতে উল্লিখিত 'সারি গান' মাঝি মাল্লারা গভীর সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময় বৈঠার তালে তালে গাইত। ময়মনসিংহ, বরিশালের প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত সারিগান আসলে লোকসঙ্গীতে বিশেষ একটি পর্যায়।

অধিকাংশ বারোমাসি গান নারী জীবনাশ্রিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা চাষার মুখ দিয়ে বারোমাসি গান গাইয়েছেন। বারোমাসি গান আসলে বারোমাসের বিরহসূচক কাহিনীমূলক লোকসঙ্গীত। এই পালার অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা প্রভাতী গানের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন -

"কার্ত্তিক মাসে পরভাতে গান
কুয়ায় ঢাইক্যা রয়।
নয়ান মাঝি পরভাতী গান
গাইয়া নাও বায়।'[৩০]

(খ) লোকক্রীড়া

লোকক্রীড়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী আর্চার টেলর একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর মতে—

> *"ছেলে খেলা বলে যাকে আমরা স্নেহ এবং উপেক্ষার চোখেই দেখতে অভ্যস্ত, বস্তুতপক্ষে তার মধ্যে ছেলেমি এবং খেলার ভাগটুকু নেহাতই আপেক্ষিক; প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের সামাজিক বিবর্তনের অজস্র স্মৃতিই তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে।'*[৩১]

প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন থেকে খেলাধূলার সূচনা হয়েছে বলে প্লেটো মনে করেন। এই সূত্র ধরে একথা বলে যায় যে, মানুষ প্রকৃতি ও প্রাণীর সহাবস্থানে পৃথিবীর আদিম ক্রীড়ার সূত্রপাত ঘটেছে। আবার একথাও শোনা যায় যে, মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীকুলের দৈহিক কসরত্ থেকে খেলাধূলার প্রাথমিক উদ্ভব সম্ভবপর হয়েছে।

আদিম কাল থেকে মানুষের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নানা জন নানা মত প্রকাশ করেছেন। সুইস্ মনোবিজ্ঞানী কার্লগ্রুস মনে করেন ভবিষ্যতের জীবনসংগ্রামে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি হিসাবে মানুষ ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করেন। স্ট্যানলি হল্ মনে করেন আদিম যুগের ফেলে আসা জীবনকে মানুষ ক্রীড়ার মধ্য দিয়ে পুনরনুষ্ঠিত করতে চায়। আবার সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মনে করেন মানবমনের অবদমিত আকাঙ্খা ক্রীড়ার মধ্য দিয়ে মুক্তিলাভ করে। তবে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য লোকক্রীড়ার উদ্দেশ্য কিন্তু অবদমিত আকাঙ্খার মুক্তি ঘটানো নয়। সমস্ত লোকক্রীড়ার মধ্য দিয়ে ফেলে আসা ও চলমান সমাজের বিচিত্র সব জীবনচিত্র প্রতিভাত হচ্ছে অনবরত। আর সেকারেণ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কোনো লোকক্রীড়া পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে ক্রীড়াটি সমাজ জীবনের কোনো না কোনো রূপ প্রকাশ করতে সক্ষম। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, লোকক্রীড়া মাত্রই কোনো একটি সমাজরে জীবনানুকৃতি দিয়ে গড়া।

লোকসংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মতো মৌখিকতা, পাঠান্তর ও রসভোগী সমাজ—এই তিনটি ধর্ম লোকক্রীড়ায় ও বিদ্যমান। আর একারণে সমাজের নতুন নতুন উপাদান সংগ্রহ করে লোকক্রীড়া স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। তাই আদিম যুগের লুকোচুরি খেলা, পরিবর্তী যুগে চোর পুলিশ খেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, লোকক্রীড়ার মুখ্য উপজীব্য বিষয় হল আনন্দ, পুরস্কার জেতা সেখানে গৌণ্য। কয়েকটি লৌকিক ক্রীড়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই সমস্ত লৌকিক ক্রীড়ার মধ্যে আমাদের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের প্রত্নাবশেষ নানা আবরণে আত্মগোপন করে আছে।

কানামাছি খেলার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে মানুষের কতকগুলি আদিম সংস্কার। আদিম মানুষদের ধারণা ছিল শারীরিক প্রতিবন্ধীরা একটা অলৌকিক ক্ষমতা বলে তাদের জীবন যাত্রা চালিয়ে যেত। স্পর্শমূলক জাদু সংস্কার বশতঃ অন্ধকে না ছোঁবার একটা প্রয়াস আদিম মানুষেদের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। তারা ভাবত অন্ধকে স্পর্শ করলে নিজেরা হয়তো দৃষ্টিশক্তি হারাবে। আর এর ফলে হয়তো আদিম সমাজে শিশু এই খেলার আদিমতম রূপটি তৈরী করেছিল—'কানামাছি ভো ভো, যাকে পাবি তাকে ছোঁ'।

কুমির কুমির খেলা আসলে শ্বাপদসঙ্কুল জল জঙ্গলচারী মানুষের জীবনযাপনের প্রতিভাসবাহী। কুমির তোমার জলকে নেমেছি খেলার সময় জলকে নেমে নদী পারহবার সময় কুমির ধরতে এলে বাঁচবার একমাত্র পথ হল বুড়ি ছুঁয়ে ফেলা। বুড়ি হল নিরাপদ আশ্রয়, তাকে স্পর্শ করতে পারলে কোনো বিপদ থাকবে না। এই সংস্কার খেলার মধ্যে বুড়িকে উপস্থিত করছে। অরণ্যচারী মানুষ হয়তো অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে বুড়ির মতো একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতো।

নারী পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক ও বিবাহ প্রথা কিভাবে পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে আধুনিক রূপলাভ করেছে তার বেশ খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায় জোড়বাঁধাবাঁধি ও বউবাসন্তী—এই দুটি খেলার মধ্যে। জোড়বাঁধাবাঁধি খেলায় প্রথমে গণনা পদ্ধতি অনুসারে একজনকে চোর বলে ধরা হয়। অন্যসকলে দুজন দুজন করে হাত ধরে দাঁড়ায় । এই দুজন অবশ্যই একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। খেলা শুরু হলে প্রত্যেকে জোড় ছেড়ে ছোটাছুটি করতে করতে বলে, জোড় ছেড়েছি। এসময় চোর যদি কোনো একজনকে ছুঁয়ে দেয় তাহলে অন্য জন চোর প্রতিপন্ন হয়। এই খেলার মধ্য দিয়ে আদিম সমাজে বিয়ে করা এবং বিয়ে ভাঙার বেশ কিছু সামাজিক প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। এই খেলা থেকে অনুমান করা যায় যে, আদিম সমাজে নারী পুরুষের অবাধ যৌন স্বাধীনতা ছিল।

বউ বসন্তী খেলার মধ্য দিয়ে আদিম সমাজে কন্যাহরণ করে বিবাহ করা এবং তাতে বাধা দানের বাস্তব চিত্র প্রতিভাত হয়। এই খেলায় একদল একটি মেয়েকে আঁটকে রাখে আর অন্য দল তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। এই মেয়ে আসলে বউ। বউ যদি পাহারাদারদের এড়িয়ে উদ্ধারকারী দলের এলাকায় প্রবেশ করতে পারে তাহলে পাহারাদাররা পরাস্ত হয়। আবার উদ্ধারকারী কাউকে যদি পাহারাদাররা ছুঁয়ে দিতে পারে তাহলে উদ্ধারকারীরা পরাস্ত হয়। স্পষ্টতঃ এই খেলার মধ্যে আদিম সমাজের এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর নারীলুণ্ঠনের সামগ্রিক কাঠামোটি সন্দেহাতীতভাবে বজায় আছে।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মুখ্য উপলক্ষ দুটি হল—নারী ও জমি। নারী লুণ্ঠন, বিবাহ করা বা বিবাহ ভাঙা ইত্যাদি স্মৃতির অবশেষ লুকিয়ে আছে বউবাসন্তী বা জোড়বাঁধাবাঁধি খেলার মধ্যে। আবার হাডুডু, কবাডি, গদি, প্রভৃতি খেলার মধ্যে রয়ে গেছে জমির অধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের অনুসূত্র। গভীর ভাবে অনুধ্যান করলে দেখা যাবে সমস্ত খেলার মধ্যে আদিম সমাজের আর্থসামাজিক জীবনধারার কোনো না কোনো দ্বান্দ্বিকসূত্র আত্মগোপন করে আছে। লোকক্রীড়ার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করতে পারলে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনকে অনুধাবন করা সহজতর হয়। সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে লোকক্রীড়ার মধ্যে অতীত ইতিহাসের অজস্র স্মৃতি লক্কায়িত আছে।

একথা আমরা প্রায়শই বলে থাকি স্বাস্থ্যই সম্পদ, স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য। সমাজের অবিচ্ছেদ্দ অঙ্গ খেলা সমাজের স্বাস্থ্য স্বরূপ। খেলাধূলা জীবের সহজাত প্রবৃত্তি। মানব জগৎ ও প্রকৃতি জগতের সহাবস্থানে পৃথিবীতে আদিম ক্রীড়ার সূত্রপাত ঘটেছে। আধুনিক বিভিন্ন খেলায় নানাবিধ সামাজিক আচার পালিত হয়। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক খেলাধূলা প্রাচীন খেলাধূলার মার্জিত রূপমাত্র। আধুনিক শহুরে খেলাধূলা অপেক্ষা আদিম গ্রাম্য খেলাধূলার সামাজিক গুরুত্ব অধিক। গ্রামীণ লোকক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ

প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। লোকক্রীড়া মানবমনে সামাজিক আদর্শ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের জাগরণ ঘটায়, সাহস ও সহিষ্ণুতা আনে-বিপক্ষের সঙ্গে ন্যায় ব্যবহারের প্রবণতা জাগ্রত করে। তবে আধুনিক খেলায় প্রতিযোগিতা মুখ্য বিষয় হওয়ায় সেখানে ব্যক্তির যশোলাভ, অর্থলিপ্সা, অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা উত্তেজনা প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আদিম লোকক্রীড়ায় প্রতিযোগিতা না থাকার কারণে ব্যক্তি ও সমাজে উভয়েরই বিকাশ সাধিত হত।

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সাতটি খণ্ডের বিভিন্ন পালায় কোন্ কোন্ লোকক্রীড়ার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। নিম্নে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল—

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার' প্রথম খণ্ডের প্রথম পালা 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায় পালক পিতা হুমরা বেদে, কন্যা মহুয়াকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজী খেলার সমস্ত রকম কৌশল শেখাতে শুরু করে। এই বাজী খেলা আসলে বাঁশের লাঠিকে চালনা করার কৌশল। এই খেলা দেখিয়ে লোককে আনন্দ দান করা হলেও এর মুখ্য বিষয় হল আত্মরক্ষার জন্য বাঁশের লাঠিকে ইচ্ছামত চালনা করে শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে আঘাত হানা। অনুমান করা যায় যে আদিম গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে একগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর লড়াইয়ে জয়লাভ করতে হলে বাজী খেলা জানা অবসম্ভাবী ছিল। মহুয়ার বাজী খেলা শিক্ষার মধ্য দিয়ে একথা স্পষ্ট হয় যে সমসাময়িককালে মেয়েরাও পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে যুদ্ধ করতে পারত। এই বাজী খেলা আসলে আদিম লোক ক্রীড়া।

পালা রচয়িতা দ্বিজ কানাই তাঁর পালার একটি ছত্রে বলেছেন—

"এক দুই তিন কইর‍্যা যুলো বচ্ছর যায়।
খেলা কস্‌রত, তারে যতনে শিখায়।।"[৩২]

এ পালার অন্যত্র আমরা দেখতে পাই হুমরা বেদে তার দলবল নিয়ে নদ্যার চাঁদের বাড়িতে বাজী খেলা দেখাতে এসেছে। সেখানে পালার নায়িকা মহুয়ার খেলা দেখানো সম্পর্কে পালা রচয়িতা বলছেন—

"দড়ি বাইয়া উইঠ্যা যখন বাঁশে বাজী করে"।[৩৩]

এই লোকক্রীড়ার মধ্য দিয়ে শরীর চর্চার সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার কৌশল অর্জন করা যায়—মনে জাগে আত্মবিশ্বাস।

এই খণ্ডের 'সুন্দরী মলুয়া' পালায় পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী পাশা খেলার উল্লেখ করেছেন। আদিম সমাজে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে কোনো গোষ্ঠী যখন পেশী শক্তিতে পেরে উঠত না, তখন বুদ্ধি বলে পাশা খেলার মাধ্যমে অন্য গোষ্ঠীর উপর নিজের অধিকার কায়েম করত। প্রমাণ স্বরূপ আমরা মহাভারতে পাণ্ডবদের সঙ্গে কৌরবদের পাশা খেলার উল্লেখ করতে পারি। সেখানে পেশী শক্তিতে দুর্বল হয়ে ও কৌরবরা বুদ্ধিবলে পাশা খেলায় জয়লাভ করে পাণ্ডবদের সমস্ত কিছুর উপর নিজেদের অধিকার কায়েম করেছিল। আলোচ্য পালায় আমরা দেখতে পাই, পালার নায়ক-নায়িকা চাঁদ বিনোদ ও মলুয়া পাশা খেলার মাধ্যমে মূলত একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় পাশাখেলা শুধু মাত্র লোকক্রীড়া হিসাবে মানবমনে আনন্দ দানের বিষয় হয়ে থাকেনি, প্রচ্ছন্নভাবে একের উপর অন্যের অধিকার কায়েমের বিষয় হয়ে উঠেছে। 'সুন্দরী মলুয়া' পালার রচয়িতা চন্দ্রাবতী লোকক্রীড়া হিসাবে পাশাখেলার উল্লেখ করেছেন—

"পাশাখেলায় চাঁদ বিনোদ মলুয়ারে লইয়া।
পাশায় হারিল বিনোদ চিতের লাগিয়া।।"[৩৪]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার' তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পালা 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় পালারচয়িতাগণ (নয়ানচাঁদ ঘোষ, রঘুসুত, শ্রীনাথ বানিয়া, দামোদর দাস) কঙ্ক ও লীলার শৈশবের নানা লোকক্রীড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন শৈশবের খেলাধূলার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সমাজবিবর্তনের অজস্র স্মৃতি। 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় পালারচয়িতাগণ বলেছেন—

"দুই না বচ্ছরের কন্যা লীলা নাম তার।
কঙ্কের সঙ্গেতে খেলে আনন্দ অপার।।" [৩৫]

এই খণ্ডের 'সুনাইসুন্দরী' বা 'দেওয়ান ভাবনা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকক্রীড়া হিসাবে পাশাখেলার উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ কালে আমরা দেখতে পাই মাধব, সোনাইসুন্দরীকে চিঠিতে লিখেছে—

"বাড়ির মধ্যে আছে লো কন্যা
সেইনা কামটুঙ্গীর বাসা।
রাইতের নিশি তথায় বসি
মোরা খেলাইবাম পাশা।।" [৩৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রথম খণ্ডের 'সুন্দরী মলুয়া' পালায় পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী লোকক্রীড়া হিসাবে পাশা খেলার উল্লেখ করেছেন। সেখানে পাশা খেলার সমাজিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পঞ্চম খণ্ডের 'ছুরতজামাল অধুয়া সুন্দরী' পালায় পালা রচয়িতা ফৈজু ফকির লোকক্রীড়া হিসাবে চিচ্‌রানি খেলার উল্লেখ করেছেন। এই চিচ্‌রানি খেলা আসলে কবাডি খেলার নামান্তর মাত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কবাডি খেলায় দুই দলের মাঝের সীমারেখাটিকে বিভিন্ন অঞ্চলে চরাই বলে। গ্রামীণ ভাষায় পশুচারণভূমিকে চরাই বলা হয়। তাই তাৎপর্য পূর্ণভাবে কবাডি খেলার মধ্যে প্রাচীন কালীন প্রতিভাস লুকিয়ে আছে। কাবাডি খেলায় নিজেদের এলাকা থেকে একদমে বিপক্ষের এলাকায় গিয়ে হানা দিয়ে তৎক্ষনাৎ ফিরে আসার ব্যাপারটা আদিম যুগে পশুশিকার করা, ফসল বা ফলমূল ছিনিয়ে আনার সূচক স্বরূপ বলে মনে করা যায়।

বাইন্যাচঙ্গ মুলুকের দেওয়ান দুলাল একদিন বনে শিকার করতে গিয়ে ক্রীড়ারত ছুরতজামালকে দেখতে পান। পালা রচয়িতা ফৈজু ফকির ছুরত জামাল এর সৌন্দর্য্য বর্ণনা এবং বনের রাখাল ছেলেদের সঙ্গে চিচ্‌রানি বা কবাডি খেলার প্রসঙ্গটি পালার দুটি ছত্রে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন—

"পুন্নমাসীর চান যেন ছুরত জামাল।
চিচ্‌রানি খেলে সঙ্গে বনের রাখাল।।" [৩৭]

আবার এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা ফৈজু ফকির চৌঘুড়ি খেলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছন। আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে চৌঘুড়ি খেলার উল্লেখ রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই চৌঘুড়ি খেলা অনেকটা পোলো খেলার মতো। 'ছুরত জামাল অধুয়া সুন্দরী' পালায় পালা রচয়িতা ছুরত জামালের ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে —লোকক্রীড়া হিসাবে চৌঘুড়ি খেলার উল্লেখ করেছেন—

"ঘোড়ায় চড়িয়া জামাল চৌঘুড়ি খেলায়।
হাঁটিয়া যাইতে স্বপন পন্থে লাগল পায়।।" [৩৮]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'কবরের কান্না' পালায় অজ্ঞাত পালারচয়িতা ছোটোবেলার খেলা হিসাবে টিবাটিবির খেলার উল্লেখ করেছেন। পালার নায়ক, নায়িকাকে উদ্দেশ্য করে যে কথা বলেছে, তার মধ্যে শৈশবের লোকক্রীড়া

হিসাবে টিবাটিবি খেলার কথা উঠে এসেছে—

"ছিবাতলায় টিবাটিবি ছোড়কালের খেলা।
অহন তুমি পত্থর হয়্যা
ভুলি কেন রে গেলা রে—
হায় ভুলি ক্যামনে গেলা।।" [৩৯]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত 'মলয়া কন্যা'র পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকক্রীড়া হিসাবে পাশাখেলার উল্লেখ করেছেন। প্রাচীনকালে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যগোষ্ঠী পেশিশক্তিতে পেরে না উঠলে, বুদ্ধি বলে পাশা খেলার মাধ্যমে একে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করত। আদিম যুগের এই লোকক্রীড়া সম্বন্ধে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বলেছেন—

"ভাদ্দর মাসে পরানবন্ধু কামটুঙ্গি ধরে।
মলয়ারে লয়্যা কত পাশাখেলা করে।।" [৪০]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সপ্তম খণ্ডের 'দেওয়ান ঈশাখাঁ'র পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকক্রীড়া হিসাবে পলাখুজি বা লুকোচুরি খেলার উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করলে দেখা যাবে, দেওয়ান ঈষা খাঁ বিশাল নৌবহর নিয়ে দিল্লীর বাদ্‌শাহর কাছ থেকে জঙ্গলবাড়ি ফেরার পথে শ্রীপুর শহরের ঘাটে কেদার রায়ের বোন সুভদ্রা সুন্দরীকে সখীগণের সঙ্গে লুকোচুরি বা পলাখুজি খেলতে দেখেন। কেউ পালিয়ে থাকলে তাকে খুঁজে বার করবার প্রবণতা থেকে পলাখুজি নামকরণ হয়েছে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে লোকক্রীড়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, অঙ্গীভূত করে নেয় সমাজের নতুন নতুন উপাদানকে। তাই একযুগের লোকক্রীড়া পরবর্তীযুগে পরিবর্তিত হয়ে যায় এভাবে — পলাখুজি>লুকোচুরি>চোরপুলিশ। অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার দুটি ছত্রে পলাখুজি বা লুকোচুরি খেলার উল্লেখ করেছেন—

"সখীগণে সাথে কইন্যা পলাখুজি খেলে।
আৎকা নজর পইড়্‌ল কইন্যার পদ্মানদীর জলে।।" [৪১]

সপ্তম খণ্ডের 'কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ' পালায় কবি লোকক্রীড়া হিসাবে পাশাখেলার উল্লেখ করেছেন। পালাকার দেখিয়েছেন রামচন্দ্র ও সীতাদেবীর মধ্যে পাশা খেলায় সীতাদেবী জয়লাভ করেছেন—

"পড়িল পাশার দান গো খেলিতে খেলিতে।
হারিলেন রামচন্দ্র গো সীতাদেবী জিতে।।" [৪২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডের 'সুন্দরী মলুয়া' পালায়, তৃতীয় খণ্ডের 'সুনাই সুন্দরী' পালায় এবং ষষ্ঠ খণ্ডের 'মলয়া কন্যা'র পালায় পাশা খেলার উল্লেখ আছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আদিম কালে লোকক্রীড়া হিসাবে পাশা খেলার গুরুত্ব ছিল।

(গ) লোকশিল্প

শিল্প কী? তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আজ পর্যন্ত কম হয়নি। পরবর্তী সময়ে লোকশিল্প কী? এই আলোচনার শুরুতে শিল্প সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই আলোচনার শুরুতে বলে রাখা প্রয়োজন যে, শিল্প তার সৃষ্টি ও প্রকাশকে সুনির্দিষ্ট উপলব্ধি ও প্রয়োজনের বাঁধনে জড়িয়ে যদি লুকিয়ে রাখতে পারে তবেই তার সার্থকতা ও পরম চরিতার্থতা। লোকশিল্প এই সর্বজনীন সূত্রের অংশীদার। মোটামুটিভাবে দুটি ধারায় শিল্পী

তাঁর শিল্প সৃষ্টির ধারাকে প্রবহমান রাখেন। প্রথমত, শিল্পী তাঁর ব্যক্তিগত নান্দনিক পরিতৃপ্তির জন্য শিল্প সৃষ্টি করে থাকেন। দ্বিতীয়, সমাজ অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে শিল্পী সমাজ পরিবেশের চাহিদামত শিল্প সৃষ্টি করেন। আদিম সমাজের একজন হিসাবে লোকশিল্পী উৎসব, ব্রত ও আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে শিল্প সৃষ্টি করে থাকেন। সমাজের সর্বজনীন শিল্প সামগ্রীর চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে শিল্পী একদিকে যেমন শিল্পচর্চা জনিত নৈপুণ্য অর্জন করেন, অন্যদিকে তেমন জীবিকা অর্জনের পথ ও প্রশস্ত করেন।

একদিকে শিকার, সংগ্রহ, কৃষি এবং নানাবিধ শ্রমপ্রক্রিয়া আর অন্যদিকে অনির্দেশ্য অলৌকিক প্রত্যয়, জাদুসংস্কার এবং ধর্মবিশ্বাস একসঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল আদিম শিল্পকলা। আর, এই আদিম শিল্পকলা ক্রমবিবর্তিত হতে হতে লোকশিল্পে পরিণতি পেয়েছে। আদিম ধর্মবিশ্বাস ও জাদুসংস্কারের অন্তরালে আলপনা, সরা, ঘট, পুতুল, মুখোশ, কাঁথা, পট প্রভৃতি ক্রিয়াশীল থাকলে ও ব্যবহারিক কারণ উপলক্ষে লোকশিল্পের প্রত্যক্ষ আত্মপ্রকাশ ঘটে।

আদিম মানুষ গুহার দেওয়ালে যেসব ছবি আঁকত তার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র রূপসৃষ্টি করা নয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার প্রবণতা ও ছিল। তবে আদর্শ শিল্প ও লোকশিল্প এক নয়। ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই শিল্পের জন্ম। অধুনা সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে বুদ্ধি বিকাশের ফলে শিল্পীর কুশলতা বেড়েছে। লোকশিল্পের আধার হল আদিম আচার অনুষ্ঠানের স্মৃতির ভগ্নাংশ। বাংলার লোকশিল্পের লৌকিক ঐতিহ্য আজও বাংলার গ্রামে-গঞ্জে-জেলায় মৌলিক রূপে টিকে আছে। বাংলার লোকশিল্পীরা আজ ও বাঁশের ঝুড়ি, বেতের শীতলপাটি, কাঠে খোদাই করা আসবাবপত্র, হাতির দাঁতের কাজ, সোলার কাজ, শাঁখের কাজ - ইত্যাদি কাজে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবে শহুরে সংস্কৃতির চাপে কালিঘাটের পটশিল্প আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে বাঁকুড়া, বীরভূম, মৈমনসিংহের পটশিল্পীরা আজও তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন স্তরের আকর্ষণ বিকর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতেই লোকশিল্পের জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি। লৌকিক এবং অভিজাত - সংস্কৃতির এই দুটি স্তর শ্রেণীগত বিরোধ সত্ত্বেও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই দুটি স্তরের দুটি সংস্কৃতির ধারা পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে। সেকারণে ঐতিহ্যবাহী মুখোশের মূর্তিতে ফুটে ওঠে জনপ্রিয় খেলোয়াড়দের প্রতিচ্ছবি। নক্সী কাথার সেলাইয়ের মধ্যে এসে উঁকি দেয় কাশ্মীরী শালের কারুকার্য। মানুষের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিল্প সৃষ্টির অন্তর্লীন ব্যঞ্জনাগুলো উত্তরোত্তর বদলে যাচ্ছে। প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে উঠেছে নিত্য নতুন শিল্পমাধ্যম। ফলস্বরূপ আদিম গুহাবাসী মানুষের শিল্পকলা ও নতুন ধারার অভিব্যক্তিতে বদলে গেল। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে লোকশিল্পের ঐতিহ্যানুসারী রূপায়ণের বিবর্তন অবসম্ভাবী -

> *"ইংরেজের আবির্ভাবের পর 'বাবু কালচার' এর বিস্মৃতির ফলে বাংলার এই লোকশিল্প ক্রমশঃ অবহেলিত হয়ে ম্রিয়মান হয়ে পড়লেও গণবাংলার প্রাণশক্তি আজও মোটের উপর এইদিকেই উৎসারিত।"*[৪৩]

ব্রত, পূজা, পার্বন, উৎসব, অনুষ্ঠান - ইত্যাদিতে মাঙ্গলিক উপাচার হিসাবে আলপনা বহুকাল ধরে ঐতিহ্য পরম্পরায় লোকশিল্পের অংশরূপে পরিগণ্য হয়ে আসছে। তবে আলপনাকে নিছক শিল্প মাত্র বলা যায় না - এর মধ্যে লুকিয়ে আছে মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির ফেলে আসা কালের অজস্র স্মৃতি। আলপনার সাহায্যে চিত্রিত বিচিত্র ধরণের চিহ্ন ও প্রতীকী চিত্রের মধ্যে মানুষের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাক্রমটি প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে। বাংলার লোকশিল্পের খাঁটি, ব্যবহারিক প্রকাশ আলপনার মধ্যেই ফুটে উঠেছে। শস্য বপন, ফসলতোলা, নৌকায়

বাণিজ্যযাত্রা ইত্যাদি আদিম জীবনযাত্রার মধ্যে আলপনার অবিকৃত রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। তবে ক্রমপরিবর্তনশীল শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আলপনার ব্যবহার ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে -

> *"বাংলার লোকশিল্পের প্রাণশক্তি আজ আর তেমন আবেগের সঙ্গে উৎসারিত নয়। কারণটা প্রত্যক্ষ এবং অনিবার্য। বাংলার যে লেখাপড়া না জানা গ্রামকন্যারা তাদের শ্যামস্নিগ্ধ আর অত্যন্ত অনায়াসলব্ধ সহজ শিল্প সৃষ্টি ক্ষমতাকে প্রকাশ করেছিলেন এইসব ছড়া আর ছবির মারফত সেই পল্লীবধূদের অধিকাংশই আজ দেশের বুকে ভৌগোলিক অস্ত্রোপচারের ফলে ছিন্নমূল।"*[৪৪]

বিশ্বের সমস্ত সংস্কৃতিতে লোকায়ত শিল্পকলা হিসাবে চিত্র, অলংকরণ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এই চারটি প্রকরণকে গণ্য করা হয়। এই চারটি প্রকরণের বহুবিচিত্র ভাগ - উপভাগ রয়েছে। আলপনা, কাঁথা, পট, সরা, ঘট, তাস প্রভৃতিতে চিত্রকলা উল্লেখযোগ্য নমুনা মেলে। আবার শাড়ির পাড়ে আঁচলে ঘট, কুলো, প্রভৃতিতে লোকশিল্প হিসাবে অলংকরণের ছাপ স্পষ্ট। হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়োর দেওয়াল গাত্রে বিভিন্ন জীবজন্তুর মূর্তি খোদাই থেকে শুরু করে অজন্তা ইলোরা গুহাচিত্রে, ভারহুত সাঁচী বুদ্ধগয়া, অমরাবতী, নাগার্জুন কোণ্ডার, খোদাই করা প্রস্তর স্তম্ভে, কোনারকের সূর্যমন্দির গাত্রে স্থাপত্য শিল্পীরা তাদের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন টিকিয়ে রেখেছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব সব নিদর্শন ঢাকা, কলকাতা ও অন্যান্য সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র প্রাসাদ ও মন্দির গাত্রে সুপ্রাচীন ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। কাঠের পুতুল, দেবদেবীর কাষ্ঠনির্মিত সিংহাসন, মাটির পুতুল, শোলা ও কাগজের তৈরী খেলনা, ধাতু নির্মিত গয়না, কাঠের মুখোশ, খাট, পালঙ্ক চৌকি প্রভৃতি আসবাবপত্রে, নৌকা নির্মাণে, শাঁখ, ঝিনুক, কড়ির গয়না তৈরীতে দারুশিল্পী, মৃত্তিকা শিল্পী ও ধাতুশিল্পীরা ভাস্কর্য শিল্পের ধারাবাহিকতা টিকিয়ে রেখেছেন -

> *"চিত্রকলায় বাংলায় লোকশিল্পের প্রকাশ পুঁথির ছবিতে, পিঁড়ি, কুলো, হাড়ি - কলসী, লক্ষ্মণসরা, ঝাঁপি, চালের কাঠা প্রভৃতি মণ্ডন শিল্পে, প্রতিমার চালচিত্রে, ব্রতের আলপনায়, আর সবচেয়ে বেশি পটের ছবিতে। ভাস্কর্যে তেমনি বাংলার লোকশিল্প সবচেয়ে ঐশ্বর্যময় পোড়ামাটির মূর্তি-বিগ্রহে, খেলনা-পুতুলে, কাঠের গায়ে কুঁদে তোলা মূর্তির কাজে কিংবা কাঠের তৈরী মূর্তিতে।"*[৪৫]

সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানা প্রকারের ব্যবহারিক প্রয়োজন নতুন নতুন লোকশিল্পের জন্ম দেয়। লোকশিল্পী তার নিজের সমাজ অভীপ্সা থেকে নান্দনিক পরিতৃপ্তির জন্য শিল্পসৃষ্টি করেন। তবে নান্দনিক পরিতৃপ্তি ছাড়াও শিল্পীকে সমাজ - অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে ও শিল্পের চাহিদা পূরণ করতে হয়। উত্তরকালে ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধতাকে অতিক্রম না করে লোক শিল্পের মধ্যে নান্দনিকতার অভিভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। লোকসংস্কৃতির অনুরাগী গবেষক ড. পল্লব সেনগুপ্ত মহাশয় লোকশিল্পের সম্পূর্ণ মূর্তিটিকে একটি চিত্রের সাহায্যে দেখিয়েছেন -

লোকশিল্প	নান্দনিকতা	৩ ↑
	ব্যবহারিক প্রয়োগ	২ ↑
	জাদু ও ধর্ম বিশ্বাস	১

৪৬

অবশেষে বলা যায় যে, লোকশিল্প লোকসংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ। মানবসভ্যতার চলমান জীবনধারার সঙ্গে

সঙ্গতি রেখে সমাজের বিভিন্ন স্তরের আকর্ষণ - বিকর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে নানাপ্রকারের ব্যবহারিক প্রয়োজনে অধুনা নিত্য নতুন লোকশিল্প সৃষ্টি হয়ে চলেছে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে বর্তমানে লোকশিল্পীগণ লোকশিল্প নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন।

বর্তমানে সমস্তরকম আসবাবপত্র নির্মানে, পাকাবাড়ি নির্মানে, ঘর সাজানোর বিভিন্ন শৌখিন জিনিসপত্র নির্মানে, দেবী প্রতিমার সাজসজ্জায়, বিভিন্ন রকমের পোষাকে সূক্ষ্ম সুতোর কাজে, বিভিন্ন ধাতু বিশেষত সোনার রূপার গহনা নির্মানে প্রভৃতি ক্ষেত্রে লোকশিল্পের অভিনবত্ব লক্ষিত হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক লোকশিল্পের মূল শিকড় নিহিত আছে আদিম শিল্পকলার অন্দরে। তাই একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, বর্তমান বিশ্বায়ণের যুগে ও লোকশিল্পের কদর এতটুকু কমেনি, বরং বেড়েছে।

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত ''প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা''র সাতটি খণ্ডের বিভিন্ন পালায় কোন কোন লোকশিল্পের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে নিম্নে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল—

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত ''বাইদ্যা কন্যা মহুয়া'' পালায় নায়িকা মহুয়া, পালক পিতা হুমরা বেদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নদ্যার চাঁদকে নিয়ে গভীর অরণ্যে আশ্রয় নেয়। এখানে নদ্যার চাঁদ অসুস্থ হয়ে পড়লে এক সন্ন্যাসী তাকে সুস্থ করে তোলে। নদ্যার চাঁদ সুস্থ হয়ে খাবার প্রার্থনা করলে কপট সন্ন্যাসী মহুয়াকে খুশী করবার জন্য ঢাকিতে করে ভাত সহ নানা খাদ্য সামগ্রী এনে দেয়। এই ঢাকি আসলে বেতের তেরী ঝুড়ি বা ধামা। এই ঝুড়ি আসলে লোকশিল্পের নমুনা। এই লোকশিল্পকে আশ্রয় করে তখনকার দিনের মানুষ ঢাকি তৈরী করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করত। একটু গ্রাম্য এলাকায় আজও শস্য মাপবার জন্য বা বহন করবার জন্য বেতের তৈরী ঝুড়ি বা ধামা ব্যবহৃত হয়। পালা রচয়িতা দ্বিজ কানাই একটি ছত্রে এ প্রসঙ্গে বলেছেন -

"ঢাকি ভইর‍্যা আইন্যা দিল মহুয়া যাহা চায়।
কন্যারে খুশি করার লাইগ্যা সন্ন্যাসীর দায়।।"[৪৭]

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লিখেছেন, নায়িকা মহুয়া পাখির পালক, লতাপাতা, ইত্যাদি দিয়ে অতি সুন্দর শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করে। এ থেকে বোঝা যায় তৎকালীন সমাজে এই ধরণের লোকশিল্পের প্রচলন ও চাহিদা ছিল। বর্তমান কালে ও পাখির পালক ও লতাপাতা দিয়ে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের ব্যবহার লক্ষিত হয়। পালা রচয়িতা একটি ছত্রে এই লোকশিল্পের উল্লেখ করেছেন -

"পাখির পালক লতা পাতা ঘাস প্রভৃতি দিয়ে
মহুয়া সুন্দর সুন্দর শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করে।।"[৪৮]

এই খণ্ডের ''সুন্দরী মলুয়া'' পালায় রচয়িতা চন্দ্রাবতী লোকশিল্পের নমুনা হিসাবে টাইল বা বড়ো ডোলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। আড়ালিয়া গ্রামের মোড়ল হীরাধর বড়ো ডোল বা টাইলে করে শস্য রাখত। বাঁশ চেরাই করে এই টাইল বা ডোল বানানো হতো। এখনো কৃষিপ্রধান অঞ্চলে এই টাইল বা ডোল শস্য রাখবার জন্য ব্যবহৃত হয়। রচয়িতা চন্দ্রাবতী তার পালায় এই লোকশিল্প সম্পর্কে বলেছেন -

"পঞ্চপুত্র হয় তার অতি ভাগ্যবান।
ষরু শস্যে ভরা টাইল গোলা ভরা ধান।।"[৪৯]

'সুন্দরী মলুয়া' পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকশিল্প হিসাবে তাজ অর্থাৎ জরির কাজ করা টুপির উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন সমাজে লোকশিল্পীরা তাজ বা টুপি বানিয়েও জীবনধারণ করত। লোকশিল্প একদিকে যেমন নান্দনিকতার পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করত। পালায় আমরা দেখতে পাই অত্যাচারী

দেওয়ান মলুয়াকে নিয়ে কোড়া শিকারে যায়। সেখানে মলুয়ার পঞ্চভ্রাতা দেওয়ানকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে। এসময় বাতাসে দেওয়ানের তাজ উড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা বলেছেন -

"বিলের বাতাসে মাথার তাজ উইড়্যা যায়।
পদ্মপাতার বাইরে সাদা দাড়ি ভাইস্যা রয়।।"[৫০]

এই খণ্ডের 'শ্যামরায়ের পালায়' রচয়িতা নিতাই চাঁদ লোকশিল্পের নমুনা হিসাবে চাটি বা বাঁশ চেরাই করে তৈরী চাটাই এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন সমাজে লোকশিল্প হিসাবে চাটাই তৈরীর প্রচলন ছিল। আমরা পালায় দেখতে পাই ডোমবধূর সঙ্গে শ্যামরায়ের মিলনের পর ডোম বধূ যে উক্তি করেছে সেখানে লোকশিল্পের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে -

"ঘরে আছে চাটি পাটি রে বন্ধু তাই দিব বিছায়া।
এইখানে ঘুমাও রে বন্ধু খাট পালঙ্ক ছাড়িয়া।।"[৫১]

'শ্যামরায়ের পালা'র অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকশিল্পের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ঘটনায় আমরা দেখি শ্যামরায় ডোমবধূকে নিয়ে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যায়। এবং জীবন জীবিকার কারণে শ্যামরায় ডোমের বেশে জঙ্গল থেকে নলখাগড়া কেটে এনে খাড়ি বা মাছধরার যন্ত্র এবং বিউনি বা পাখা তৈরী করে বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করে। লোকশিল্প হিসাবে তৎকালীন সমাজে মানুষ যে খাড়ি ও বিউনি বানাত পালা রচয়িতা পালায় তা উল্লেখ করেছেন -

'ডোমের বেশেতে নলখাগড়া কাইট্যা আনে রায়।
খাড়ি বিউনি বানাইয়া বাজারে বিকায়।।"[৫২]

বর্তমানেও বাঁশ বা নলখাগড়া দিয়ে লোকশিল্পীরা খাড়ি বা মাছ ধরবার যন্ত্র তৈরী করে এবং তালপাতা দিয়ে বিউনি বা পাখা বানায়।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের 'কাঞ্চনকন্যা' বা 'ধোপার পাট' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকশিল্পের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করলে আমরা জানতে পারি, তমসা গাজী বাণিজ্য যাত্রা করে তিনমাস তেরো দিন পর বাড়ি ফেরার সময় নানা দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে আসেন। এখানে পালা রচয়িতা ঝাপায় ভরে শুকনো মাছ আনার কথা উল্লেখ করেছেন। এই ঝাপা আসলে হোগলা পাতায় নির্মিত ঝুড়ি, যা লোক শিল্পের একটি নিদর্শন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমানে জেলে সম্প্রদায় এই ঝাপা ব্যবহার করে থাকেন। তৎকালীন লোকশিল্পের প্রবহমান ধারায় আজও লোকশিল্পীরা ব্যবহারিক প্রয়োজনে হোগলা, বাঁশ প্রভৃতি দ্বারা ঝাপা বা ঝুড়ি তৈরি করেন। পালা রচয়িতা তাঁর পালার একটি ছত্রে এ প্রসঙ্গে বলেছেন -

"শুকনা মাছ আটির আটি ঝাপায় ভরিয়া।
কত কত দব্ব আইনাছে বিদেশ করিয়া।।"[৫৩]

এই খণ্ডের 'রাজকন্যা রূপবতী' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা দেখিয়েছেন, রাজা রাজচন্দ্র অনেকদিন পর নবাবের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় পানসীতে করে নানা দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে খাড়ি-বিউনি অর্থাৎ মাছ ধরবার যন্ত্র এবং তালপাতা নির্মিত পাখা নিয়ে গেছেন। এই খাড়ি-বিউনি আসলে লোকশিল্পের নিদর্শন। বর্তমানেও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আজও লোকশিল্পীরা খাড়ি বা বিউনি তৈরী করে জীবনধারণ করেন। পালা রচয়িতা একটি ছত্রে এ প্রসঙ্গে বলেছেন —

"আঁবের কাকই লইল আবের বিরুনী।
আবেতে রাঙিয়া লইল খাড়ি আর বিউনি।।"[৫৪]

'রাজকন্যা রূপবতী' পালার অন্যত্র আমরা দেখি কাঙ্গালিয়া ও জাঙ্গালিয়া দুই ভাই নদীতে মাছ ধরবার সময় হাতে জাল ও কোমরে ডোলা ব্যবহার করেন। এই ডোলা আসলে বাঁশ বা বেতের তৈরী গোলাকার মাছ রাখবার পাত্র। ডোলাকে পশ্চিমবঙ্গের অনেকস্থানে খারাও বলা হয়। এই ডোলা আসলে লোকশিল্পের নিদর্শন। লোকশিল্পীগণ অনেক পরিশ্রম করে এই ডোলা তৈরী করে বাজারে বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করেন। পালা রচয়িতা একটি ছত্রে এই লোকশিল্পের উল্লেখ করেছেন -

"কোমরে বান্ধিয়া ডোলা হাতে লয়্যা জাল।
নদীর কিনারে ঘুরে সকাল বিকাল।।"[৫৫]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডের 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় পালা রচয়িতাগণ লোকশিল্পের উল্লেখ করেছেন। পালা রচয়িতাগণ লিখেছেন মাঠ থেকে কঙ্ক যখন গরু নিয়ে বাড়ি ফিরত তখন পালার নায়িকা লীলা আবের পাঙ্খা বা অভ্রখচিত পাখা দিয়ে তাকে বাতাস করত। এই অভ্রখচিত পাখা আসলে লোকশিল্পের একটি নিদর্শণ। পালা রচনার সমসাময়িক কালে লোকশিল্পীগণ অভ্রখচিত পাখা তৈরী করত। একটি ছত্রে রচয়িতাগণ লিখেছেন -

"বাথান হইতে কঙ্ক ধেনু লয়্যা আসে।
আবের পাঙ্খা লয়্যা বইসে তার পাশে।।"[৫৬]

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতাগণ লোকশিল্প হিসাবে খাউড়ি বা বাঁশ নির্মিত শস্য রাখবার পাত্র এবং বিউনা বা পাখার কথা উল্লেখ করেছেন। রচয়িতাগণ বলেছেন ডোমনারীরা খাউড়ি ও বিউনা তৈরী করে নৌকায় করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিক্রয় করে বেড়াত। প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারায় আজও বাঁশ নির্মিত শস্যাধার ও পাখা তৈরী করে লোকশিল্পীগণ জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। পালা রচয়িতাগণ বলেছেন -

"খাউড়ি বিউনা করে যত ডোমের নারী।
কত দেশে যায় তারা বাইয়া না তরী।।"[৫৭]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডের 'রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরির লড়াই পালা'য় পালা রচয়িতা লোকশিল্পের নিদর্শন হিসাবে জম্বুলরতুন বা নানা বর্ণের সুতো দিয়ে তৈরী কাঁথা দিয়ে প্রস্তুত ঝোলা বা থলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন সমাজের লোকশিল্পীগণ সূক্ষ্ম হাতের কাজও জানতেন। পালা রচয়িতা তাঁর রচনায় তা দেখিয়েছেন। বোষ্টমী শ্যামপ্রিয়া যখন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে রঙ্গমালা সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তখন তার কাছে জম্বুলরতুন বা নানা বর্ণের সুতো দিয়ে তৈরী কাঁথা দিয়ে প্রস্তুত থলে ছিল। পালার ছত্রে পালা রচয়িতা তার উল্লেখ করেছেন -

"হেকমত্যা শ্যামপ্রিয়া হেকমত করিল।
জম্বুলরতুন খুঞ্জুনিডা টানি হাতত লইল।।"[৫৮]

প্রাচীন এই ঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমানে নানা বর্ণের সুতো দিয়ে নকসা করা, শাড়ি, পাঞ্জাবী ইত্যাদি পোষাক যেমন তৈরী হচ্ছে, তেমনি নানা বর্ণের সুতো দিয়ে সেলাই করা ব্যাগ বা থলেও তৈরী হচ্ছে।

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকশিল্পের নিদর্শন হিসাবে বেত বা বাঁশের বোনা ঝুড়ির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। লোক ঐতিহ্যের বহমান ধারায় বর্তমান কৃষিকেন্দ্রিক অঞ্চলে এই ওড়া বা ঝুড়ির যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষিত

হয়। পালায় আমরা দেখতে পাই মগ নামক দস্যু উপজাতির নেতা রাম্যামগের নেতৃত্বে সমস্ত মগেরা জঙ্গলের মধ্যে নতুন প্রাসাদ তৈরীর উদ্দেশ্যে ঝোড়া কোদাল ইত্যাদি নিয়ে যাত্রা করল। পালা রচয়িতা একটি ছত্রে তার উল্লেখ করেছেন -

"একে একে নাম ধরি রাম্যা মগে ডাকিল।
ওড়া কোদাল লই মগ পথে মেলা দিল।।'[৩৫৯]

এই খণ্ডের 'মানিকতারা ডাকাইত' পালায় মানিকতারার বিবাহের সময় পালা রচয়িতা সেখ আমির উদ্দিন যেসব লৌকিক আচারের উল্লেখ করেছেন সেখানে লোকশিল্পের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। বিবাহের সময় তারার মা, মানিক-তারার পিছনে টোনা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, মানিক ও তারা তাতে ইঁদুরের মাটি ছুঁড়ে দিয়েছিল। এই বিবাহ আচারের মধ্যে টোনা বা বেতের তৈরী কাঠা লোকশিল্পের নিদর্শন হিসাবে দেখা যায়। কৃষি প্রধান অঞ্চলে আজও বেতের তৈরী টোনা বা পালি বা ধামার সাহায্যে শস্য ওজন করা হয়। এই টোনা আসলে পালি বা ধামার পূর্ববর্তী লোকশিল্পের নিদর্শন। পালা রচয়িতা একটি ছত্রে তার উল্লেখ করেছেন -

"তারার কাছে খাড়াইল মাও টোনা যে পাতিল।
দুই হস্তে এন্দুরের মাটি মানিকতারা দিল।।'[৩৬০]

আবার এই খণ্ডের 'মইষাল বন্ধু সাঁজুতি কন্যা' পালায় পালারচয়িতা উল্লেখ করেছেন, কামুনীর দেশে মেয়েরা ঢাকি ভরে সোনাদানা বিক্রয় করতে আসে। এখানে উল্লিখিত ঢাকি বা বেতের তৈরী ঝুড়ি আসলে লোকশিল্পের নিদর্শন। বর্তমানে লোকসমাজে আজও ঢাকি বা বেতের তৈরী ঝুড়ি বা ধামার ব্যবহার আছে। পালা রচয়িতা একটি ছত্রে তার উল্লেখ করেছেন -

"জনানা আইব সব বেচিতে কিনিতে।
ঢাকি ভইরা সোনা আনব সদায় করিতে।।'[৩৬১]

'মইষাল বন্ধু সাঁজুতি কন্যা' পালার অন্যত্র ডিঙ্গাধর ঘটক সেজে বলরামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সময় তার বেশভূষা ও ব্যবহার্য জিনিসের বর্ণনা দিতে গিয়ে পালা রচয়িতা আড়ঙ্গি বা তালপাতার তৈরী ছাতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। এই আড়ঙ্গি আসলে লোকশিল্পের নিদর্শন। বর্ষার সময় বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে এখনো কৃষিপ্রধান অঞ্চলের মানুষ তালপাতা নির্মিত টুপি বা ছাতা ব্যবহার করেন। পালা রচয়িতা একটি ছত্রে এ প্রসঙ্গে বলেছেন -

"দীঘল কেশের ঝোঁটা শিরিতে বান্ধিল।
আড়ঙ্গি মাথায় দিয়া পন্থে মেলা দিল।।'[৩৬২]

এই পালায় আমরা ঘটককে মইষাল বন্ধুর বেশধরে সাঁজুতি কন্যার সামনে আসতে দেখি। এইসময় ঘটকের বেশভূষার বর্ণনা দিতে গিয়ে পালা রচয়িতা লোক শিল্পের নিদর্শন হিসাবে টুপ বা বাঁশ ও পাতা দিয়ে নির্মিত একপ্রকার টুপির উল্লেখ করেছেন। শৌখিন দ্রব্য তৈরীতে তৎকালীন সমাজের মানুষ যে সমান পারদর্শী ছিল পালা রচয়িতা পালায় তার উল্লেখ করেছেন -

"হাতে ফলা মাথায় টুপ কোমরেতে বাঁশি।
কন্যার সম্মুখে আইসা দাণ্ডাইল আসি।।'[৩৬৩]

উল্লেখ্য যে বর্তমানে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে এরকম বাঁশ ও পাতা নির্মিত শৌখিন টুপি দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে লৌকঐতিহ্যের হাত ধরে লোকশিল্প আজও বংশ পরম্পরায় তার ধারাকে অব্যাহত রেখেছে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পঞ্চম খণ্ডের 'কমল সদাইগরের' পালায় সদাইগরের ধনসম্পত্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকশিল্পের নিদর্শন হিসাবে আড়ি বা বেতের ছোট ঝুড়ির প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। আজও কৃষি প্রধান অঞ্চলে শস্য মাপবার জন্য 'আড়ি' ব্যবহার করা হয়। পালা রচনার সমসাময়িক কালে লোকশিল্পীগণ 'আড়ি' তৈরী করত। পালা রচয়িতা পালার একটি ছত্রে তার উল্লেখ করেছেন -

"ছাগল মহিষ ভেরা গরু লেখা জোখা নাই।।
আড়ি মাপি ট্যাক গণে কমল সদাইগর।
লক্ষ্মী মাতা আসি তার জুড়ি অছে ঘর।।'[৬৪]

এই খণ্ডের 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান সখিনা বিবি' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতার বর্ণনা অনুসারে ফিরোজ খাঁ পালঙ্কের উপর বসে আছেন আর তাঁর দাসী বাঁদীরা তাকে অভ্রখচিত পাখা দিয়ে বাতাস করছে। এই অভ্রখচিত পাখা লোকশিল্পের একটি অন্যতম নিদর্শন। তৎকালীন সমাজের লোক শিল্পীগণ তালপাতা দিয়ে পাখা তৈরী করত এবং তার উপর অভ্র দিয়ে নানারকম নান্দনিক নক্সা বা আলপনা আঁকতো। বর্তমানেও এই ধরণের শৌখিন পাখা লোকশিল্পীগণ তৈরী করে থাকেন। পালা রচয়িতা পালায় তার উল্লেখ করেছেন -

"ঠাণ্ডা হয়্যা বইসল সায়েব পালঙ্ক উপরে।
আবের পাঙ্খা লয়্যা বান্দী হাওয়া তানরে করে।।'[৬৫]

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকশিল্পের নিদর্শন হিসাবে বেতের তৈরী পেট্রার প্রসঙ্গোল্লেখ করেছেন। পালা পাঠকালে আমরা দেখতে পাই, দরিয়া নামে এক বাঁদী, ফিরোজ খাঁ এর তসবির বা ফটো নিয়ে তাজপুর শহরে সখিনা বিবির কাছে রওনা হওয়ার সময় বেতের পেট্রায় করে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে গেছে। লোকঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমানে ও বেতের পেট্রা করে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হয়। পালা রচনার সমসাময়িক কালে লোকশিল্পীগণ বেত দিয়ে এই পেট্রা বানাত। আজও উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বেতের পেটরা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এই লোকশিল্প প্রসঙ্গে বলেছেন -

"তার মধ্যে যতন কইরা তসবির রাখিল।
সাইজা গুইজা বেতের পেট্রা বান্দী কাখেতে লইল।।'[৬৬]

এই খণ্ডের 'কবরের কান্না' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকশিল্পের নিদর্শন হিসাবে রিহাল অর্থাৎ কোরাণ রাখবার কাঠের পাত্র এবং ঝালুই অর্থাৎ বেত বা বাঁশের তৈরী ঝুড়ির প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে লোকশিল্পীগণ যে ধর্মগ্রন্থ রাখবার জন্য কাঠের পাত্র এবং ঝালুই বানাতে পারত এই পালাটিতে তার প্রমাণ মেলে। বর্তমান কালেও লোকশিল্পীগণ কাঠের বাক্স ও বাঁশ বা বেতের তৈরী ঝুড়ি প্রস্তুত করে থাকেন। পালার একটি ছত্রে পালা রচয়িতা এর উল্লেখ করেছেন -

"আলীমের কুরান গেল। রিহাল ভাইসল
বারোইর গেল পান।
দোকানীর বেসাত গেল ঝালুই গেল
গিরস্থ ঘরর ধান।।'[৬৭]

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকশিল্পের নিদর্শন হিসাবে শীতলপাটির প্রসঙ্গোল্লেখ করেছেন। বন্যার পর মালেক, নুরন্নেছাকে বলেছে -

"গা তোল গা তোল আমার আধার ঘরর বাতি।
কনে মোরে দিব আর শীতলপাটি পাতি।।"[৬৮]

প্রসঙ্গত আজ ও লোকশিল্পীগণ শীতলপাটি তৈরী করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। গরমের সময় শীতলপাটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ষষ্ঠ খণ্ডের 'ভেলুয়া সুন্দরী মদন সাধু' পালায় পালা রচয়িতা লোকশিল্পের নিদর্শন হিসাবে খারি অর্থাৎ বেত বা বাঁশের তৈরী ফুল তুলবার সাজি এবং বিউনি অর্থাৎ তালপাতার তৈরী পাখার প্রসঙ্গোল্লেখ করেছেন। পালা পাঠকালে আমরা দেখি সলুকা সুন্দরী ডোমনীর বেশ ধরে খারি ও বিউনি বিক্রয়ের অছিলায় আবু রাজার পুরীতে ভেলুয়া সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। আজও লোকসমাজে খারি ও বিউনির ব্যবহার প্রচলিত আছে। লোকশিল্পীগণ আজও খারি ও বিউনি তৈরী করে জীবন ধারণ করেন। পালা রচয়িতা পালার একটি ছত্রে লোকশিল্প হিসাবে এই খারি ও বিউনির উল্লেখ করেছেন -

'ডুমুনীর বেশ ধইর‍্যা সলুকা সোন্দরী।
খারি বিউনি লয়্যা যায় আবু রাজার পুরী।।'[৬৯]

(ঘ) লোকাবৃত্তি বা পেশা

যিনি যে কাজ করে জীবন ধারণ করেন সেটি তার বৃত্তি বা পেশা। আদিম যুগে মানুষ যখন পশুশিকার করে জীবন ধারণ করত তখন সে ছিল শিকারজীবী। পরবর্তীকালে মানুষ যখন চাষবাস করতে শুরু করল তখন সে হয়ে উঠল কৃষিজীবী। কৃষির সূত্রপাত ঘটলে মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক চাহিদা বাড়তে শুরু করল। সমাজে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে নানারকম কাজ করে জীবনধারণ করতে হত। জীবন ধারণের কাজকর্মের উপর ভিত্তি করে সমাজে নানারকম বৃত্তির মানুষের আবির্ভাব ঘটল। এর ফলে সমাজে কামার, কুমোর, ছুতার, তন্তুবায় প্রভৃতি বৃত্তিজীবী মানুষের উদ্ভব ঘটল। কৃষির উদ্ভবের ফলে লৌহ নির্মিত জিনিসপত্রের প্রয়োজনে কর্মকার শ্রেণীর চাহিদা যেমন বেড়ে গেল তেমন কৃষি থেকে উৎপন্ন কাঁচা মাল পাট, তন্তুবায় বা তাঁত শিল্পীদের অর্থনৈতিক আয়ের অন্যতম উপায় হয়ে উঠল—

"পূর্ব ময়মনসিংহে পাটবস্ত্র বা পাটের শাড়ী তৈরী হতো। ময়—মনসিংহ গীতিকা ও পদ্মপুরাণে উল্লিখিত পাটের শাড়ী ছিল অত্যন্ত সৌখিন ও মূল্যবান। পল্লীসমাজে মেয়েদের বিয়ের শাড়ী বলতে বোঝাতো এই শাড়ী। দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল) ময়মনসিংহের সর্বত্র এর প্রচলন ছিল। সে পাটের শাড়ী মসলিন বস্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম পাট সুতোয় তৈরী হতো এবং তৈরী করতো অত্যন্ত দক্ষ তাঁত শিল্পীরাই।"[৭০]

কৃষিকে কেন্দ্র করে কামার শ্রেণীর মানুষরা লাঙলের ফলা, কাস্তে, কোদাল, দা, হাতুড়ি, ছেনি, নিড়ানি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈরী করেছে। কুমোর-রা বানিয়েছে মাটির কলস, মালসা, হাঁড়ি, সরা, পুতুল। ছুতার বানিয়েছে নিত্য ব্যবহার্য আসবাবপত্র। এছাড়া সময়ের সাথে সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজে নানা বৃত্তি বা পেশার সূত্রপাত ঘটেছে। সরষে বা তিল পিষে তেল বের করতে মানুষ কলু বা তৈলকার বৃত্তি গ্রহণ করল। মাছ ধরে তা বিক্রয় করে অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে মানুষ জেলে বৃত্তি

গ্রহণ করল। মানুষকে নৌকায় করে নদী পারাপার করে দেওয়ার জন্য পাটনী বা মাঝি বৃত্তির উদ্ভব ঘটল। এভাবে আধুনিক জটিল জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে গিয়ে আরো বহু বৃত্তি বা পেশার উদ্ভব ঘটেছে। ভবিষ্যতে ও এই ধারা বহমান থাকবে।

আমরা আলোচনা করে দেখবো, ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সাতটি খণ্ডের বিভিন্ন পালায় পালারচয়িতাগণ কোন কোন লোকবৃত্তি বা পেশার উল্লেখ করেছেন।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডের প্রথম পালা 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালাটিকে সমালোচকগণ আদর্শ গীতিকার মর্যাদা দিয়েছেন। এই পালায় মহুয়ার পালক পিতা হুমরা বেদে ডাকাতি বৃত্তি গ্রহণ করে জীবন ধারণ করতেন। পালা রচয়িতা দ্বিজ কানাই পালার প্রায় শুরুতেই দুটি ছত্রে এ সম্পর্কে বলেছেন—

"ডাকাতি করিত বেটা ডাকাতির সদ্দার।
মাইনক্যা নামে ছুড়ু ভাই আছিল তাহার।।" [৭১]

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই ভবানী পাঠক ডাকাতি করেই জীবন ধারণ করত। ভবানী পাঠকের পরবর্তী কালে এই ডাকাতির সর্দারনি হয়ে ওঠে দেবী চৌধুরানী। এছাড়া দস্যুরানী ফুলন দেবীর কথা সকলের অজানা নয়।

এই খণ্ডের 'সুন্দরী মলুয়া' পালায় আমরা লোকবৃত্তি হিসাবে কুড়া (পাখি বিশেষ) শিকারের কথা জানতে পারি। পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী দেখিয়েছেন পালার নায়ক চান্দবিনোদ পাহাড়িয়া দেশে কুড়া শিকার করতে বেরিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আদিম যুগে মানুষের প্রধান বৃত্তি ছিল পশুশিকার। চন্দ্রাবতী তাঁর 'সুন্দরী মলুয়া' পালায়, পালার নায়ক চান্দবিনোদের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

"কুড়া শিকারে যাইবাম আমি পাহাড়িয়া দেশে।" [৭২]

'সুন্দরী মলুয়া' পালার অন্যত্র পালারচয়িতা চন্দ্রাবতী দেখিয়েছেন পালার নায়িকা মলুয়া তার শাশুড়ীর সঙ্গে সুতা কাটছে এবং ধান ভানছে। সাধারণত তাঁতি বৃত্তি অবলম্বনকারী ব্যক্তির পক্ষে সুতা কাটা সম্ভব। চন্দ্রাবতী দেখিয়েছেন সুতা কেটে ও ধান ভেনে মলুয়া অতি দুঃখ কষ্টে দিনপাত করছে—

"সুতা কাটে ধান ভানে শাশুড়ীরে লইয়া।
এই মতে দিন কাটে দুঃখু যে পাইয়া।।" [৭৩]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'কেনা ডাকাতের পালায়' পালা রচয়িতা কবি চন্দ্রাবতী দেখিয়েছেন দস্যু কেনারামসহ হালুয়ার সাতপুত্র ডাকাতিকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রসঙ্গত এই খণ্ডের 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায় আমরা হুমরা বেদে ও তার ভাই মাইনক্যা কে ডাকাতি করে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখেছি। পালারচনার সমসাময়িক কালে ডাকাতি বৃত্তি গ্রহণ করে যে অনেকে জীবন ধারণ করত পালা রচয়িতা তা দেখিয়েছেন—

"হালুয়ার সাত পুত্রগো ডাকাইতের সদ্দার।
ডাকাতি করিয়া কৈল দৌলত বিস্তর।।" [৭৪]

এই খণ্ডের 'আয়না বিবি' পালায় অজ্ঞাত পালারচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে নৌবাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে বাণিজ্য যাত্রার পরিচয় মেলে। পালার নায়ক মামুদ উজ্জ্বাল যে লোকবৃত্তি হিসাবে বাণিজ্যকে বেছে নিয়েছেন পালার ছত্রে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা তা ব্যক্ত করেছেন—

"নাও ডিঙ্গা বান্ধা ঘাটে, গাঙ্গে আইছে জল।
বাণিজ্য করিতে যাইবাম কিবান কথা বল।।" [৭৫]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পালা 'কাঞ্চন কন্যা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা দেখিয়েছেন যে, তমসা গাজী ধানের ব্যবসাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। পালার রচনার সমসাময়িক কালে ব্যবসা বাণিজ্যকে যে অনেকে লোক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে জীবন ধারণ করতেন, পালা রচয়িতা পালার কয়েকটি ছত্রে তা ব্যক্ত করেছেন—

"পীরের কান্দার তমসা গাজী ধানের ব্যাপারী।
পাঁচখানা ডিঙ্গা লয়্যা করে ধানের সওদাগরী।।" [৭৬]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'কমলারাণী'র পালায় পালারচয়িতা অধরচাঁদ দেখিয়েছেন পালা রচনার সমসাময়িক কালে ঘটক বৃত্তি গ্রহণ করে ও অনেকে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতেন। পালার কয়েকটি ছত্রে পালা রচয়িতা দেখিয়েছেন রূপবতী কন্যা কমলার বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে দেশবিদেশ থেকে ঘটক আসছে। পালার ছত্রে কবি অধরচাঁদ লিখছেন—

"রূপের কথা শুইনা কন্যার নানান দেশ বিদেশে।
বিয়ার সম্বন্ধ লয়্যা ঘটকেরা আইসে।।" [৭৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ও ঘটক বৃত্তি গ্রহণ করে অনেকেই তাঁদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন।

এই খণ্ডের 'রাজকন্যা রূপবতী' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা দেখিয়েছেন কাঙ্গালিয়া ও জাঙ্গালিয়া নামে দুই ভাই জাল দিয়ে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে উল্লেখ করেছেন এই দুই ভাই জেলে বৃত্তি গ্রহণ করে দিনাতিপাত করে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বহু মানুষ এই বৃত্তি গ্রহণ করে তাঁদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। কাঙ্গালিয়া ও জাঙ্গালিয়া-দুই ভাইয়ের বৃত্তি সম্বন্ধে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন—

"কাঙ্গালিয়া জাঙ্গালিয়া তারা দুইটি ভাই।
জাল বাইয়া মাছ ধরে অন্য কার্য নাই।।" [৭৮]

এই খণ্ডের 'পীর বাতাসী কন্যা' পালায় পালা রচয়িতা রজনী গোপাল দেখিয়েছেন চান্দব্যাপারী লোকবৃত্তি হিসাবে বৈদেশিক বাণিজ্য কে জীবন ধারনের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। পালার ছত্রে পালা রচয়িতা এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"এমুন সময় হইল কিবা শুন বিবরণ।
চান্দ বেপারি বৈদেশে যাইব বাণিজ্য কারণ।।" [৭৯]

এই খণ্ডের 'দেওয়ান মদিনা' পালায় পালা রচয়িতা মনসুর বয়াতি লোকবৃত্তি হিসাবে কৃষিকাজের উল্লেখ করেছেন। ধানুয়া নদীর তীরে কাজলকান্দা গ্রামের অধিবাসী ইরাধর কৃষি কাজ করে জীবন ধারণ করেন। পালা রচয়িতা মনসুর বয়াতি ইরাধরের স্ত্রীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

"আরে লক্ষ্মী না আগন মাসে
দোয়ে বাওয়ার দাওয়া মারি।
খসম আমার আনে ধান
আমি যে ধান লাড়ি।।" [৮০]

আবার দ্বিতীয় খণ্ডের 'আমিনা বিবি ও নছর মালুম' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে ঘরজার কাম অর্থাৎ কাঁচা বাড়ি তৈরীর কাজের উল্লেখ করেছেন। ঘরামী বৃত্তি গ্রহণ করে হায়দর পুত্র জীবিকা নির্বাহ করে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লোকবৃত্তি হিসাবে ঘরামী বৃত্তির উল্লেখ করেছেন—

"হায়দর বাপের নাম মাঝির গাঁও বাড়ি।
অতি কষ্টে দিন কাটে ঘরজার কাম করি।।'[৮১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আধুনিক সমাজব্যবস্থায় কাঁচাবাড়ি ও পাকা বাড়ি নির্মাণ করে অনেকে যথাক্রমে ঘরামী ও রাজমিস্ত্রি বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে শুকনো মাছ বিক্রয় করে জীবন জীবিকা নির্বাহের কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শুকনো মাছ বা শুঁটকি মাছ বিক্রয় করে অনেকে জীবন ধারণ করেন। পালা রচয়িতা পালায় উল্লেখ করেছেন যে, মাফো নামে এক ব্যক্তি এই কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন—

"শুকনা মাছ বেচে মাফো বড়ো সদাইগর।
তার বাড়িত একদিন আইল মালুম নছর।।''[৮২]

'আমিনা বিবি ও নছর মালুম' পালায় আমরা একাধিক লোকবৃত্তির পরিচয় পাই। এই পালার অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা দেখিয়েছেন। গফুর নামে এক ব্যক্তি লোকবৃত্তি হিসাবে কৃষিকাজ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। সে একজন বড়ো চাষী। সারাবছর নানারকম শস্য ফলায়। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন—

"বুড়া ক্ষেতিয়াল গফুর করে হাল চাষ।
নানান্ জাতের নানান্ ক্ষেতী পায় বারোমাস।।'[৮৩]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পালা 'লীলা কন্য কবি কঙ্ক' পালায় পালা রচয়িতাগণ লোকবৃত্তি হিসাবে ভিক্ষা বৃত্তির উল্লেখ করেছেন। কঙ্কের পিতা বিপ্রপুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ গুনরাজ সারাদিন ভিক্ষা করে অর্জিত দ্রব্যে কোনমতে জীবনধারণ করেন। পালা রচনার সমসাময়িককালে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা যে মোটেই ভালো ছিল না। কঙ্কের পিতার ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের মধ্য দিয়ে পালা রচয়িতাগণ (নয়ানচাঁদ ঘোষ, দামোদর দাস, রঘুসুত, শ্রীনাথ বানিয়া) তার বিবরণ দিয়েছেন—

"সারাদিন ভিক্ষা মাগি দুয়ারে দুয়ারে।
সইন্ধ্যা বেলা ফিরে ব্রাহ্মণ আপনার ঘরে।।
এইমতে নিত্যি যাহা করয়ে অর্জন।
ইতে কোনমতে করে জীবন ধারন।।[৮৪]

এই খণ্ডের 'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধু'র পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে শিকার করার কথা উল্লেখ করেছেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে মানুষ একাধিক বৃত্তি গ্রহণ করত। আলোচ্য পালার নায়ক মানিক সদাইগরের পুত্র আমির সাধু একদিকে শিকার করছে, আবার অন্যদিকে ব্যবসা বাণিজ্যও করছে। পালা রচয়িতা আমির সাধুর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

"শুনশুন মা জননী কহি যে তোমারে।
শীয়ারে যাইবাম আমি কালুকা ফজরে।।'[৮৫]

আবার এই পালার অন্যত্র ভেলুয়া ও আমির সাধুর বিবাহের পর আমির সাধু আর ঘরে বসে না থেকে বাণিজ্যে যেতে চায়। বাণিজ্যকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে আমির সাধু তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী ভেলুয়া সুন্দরীকে বলেছে রোজগার না করলে বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়বে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লোকবৃত্তি হিসাবে বাণিজ্য যাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন—

"সারা নিশি দুইজনে নানান কথা কয়।
পরভাতে উঠিয়া সাধু বাণিজ্যে চলি যায়।।"[৮৬]

এই খণ্ডের 'কমলা কন্যা'র পালায় পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান লোকবৃত্তি হিসাবে গোয়ালা/গোয়ালিনী বৃত্তি গ্রহণের উল্লেখ করেছেন। পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান দেখিয়েছেন চিকন গোয়ালিনী কমলার পিতা মানিক চাকলাদারের বাড়িতে ক্ষীর সর বিক্রি করে জীবনধারণ করত। পালা রচয়িতা পালায় তা উল্লেখ করেছেন—

"চাকলাদারের বাড়িতে সেই বৃদ্ধ গোয়ালিনী।
ক্ষীর সর লইয়া নিত্যি করে আনাগুনি।।"[৮৭]

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান লোকবৃত্তি হিসাবে সোয়ারীর কাম বা পালকি বাহক বৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে মানুষ পালকি বাহকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। পালার ছত্রে পালা রচয়িতা দেখিয়েছেন কমলার দুই ভাই আন্দি ও সান্দি পালকি বাহকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে—

"তার দুই ভাইয়ে করে সোয়ারীর কাম।
মায়ে ঝিয়ে লয়্যা তারা গেল মামার ধাম।।"[৮৮]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'কাফেন চোরা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে জোম ব্যাপার বা খাদ্যশস্যের ব্যবসার উল্লেখ করেছেন। চিন্তাপুর গ্রামের আজিম ব্যাপারী লোকবৃত্তি হিসাবে খাদ্যশস্যের ব্যবসাকে বেছে নিয়েছেন। অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে তার উল্লেখ করেছেন—

"কাছালং আর মাইনতিতে জোম-বেপার করে।
বছর বছর তোড়া তোড়া টাকা আনে ঘরে।।"[৮৯]

আবার এই খণ্ডে 'শীলদেবীর' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক বৃত্তি হিসাবে কৃষিকাজও ডাকাতির উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করলে আমরা দেখতে পাবো জঙ্গলীয়া নামক এক পাহাড়ী জাতির মানুষরা কৃষিকাজ না করে, ডাকাতি করে জীবন ধারণ করত। পালা রচয়িতা পালায় তা উল্লেখ করেছেন—

"পাহাড় মুল্লুকে আছে জঙ্গলীয়া জাতি।
কির্ষিকাম না করে তারা, কইরা খায় ডাকাতি।।"[৯০]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পালা 'রঙ্গমালা সুন্দরী ও চৌধুরীর লড়াই পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে পালকি বাহকদের কথা উল্লেখ করেছেন। পালার সমসাময়িক কালে পালকি বাহকের কাজ করে অনেকে জীবন ধারণ করত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এখনো পালকি বাহক বৃত্তি অবলম্বন করে এক শ্রেণীর মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। পালা রচয়িতা পালার একটি ছত্রে বলেছেন—

"আটজন বেয়ারায় পালকি কাঁধত লইল।
করিমপুর পাথারে যাই উপস্থিত হইল।।"[৯১]

আবার এই পালার অন্তর্গত, সৈরপ মালার স্বামী কালাযুগী কাপড় বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে।পালা রচয়িতা দেখিয়েছেন, কাপড় বিক্রয় করা বৃত্তি গ্রহণ করে কালাযুগী জীবন জীবিকা নির্বাহ করে—

"গেরামে আছে কালাযুগী কাপড় বেচি খায়।
ঘরে আছে সৈরপমালা তুলনা নাহি হয়।।"[৯২]

পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে পাটনীর কাজ বা নৌকায় করে মানুষজনকে নদী পারাপার করার কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। আজও নদীমাতৃক বঙ্গদেশের বিভিন্নস্থানে পাটনী বৃত্তি অবলম্বন করে অনেকেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। পালার একটি ছত্রে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বলেছেন—

"যুক্তি করি দুইজনে কইরছে আগমন।
মাধব পাটনীর ঘাটে যাই দিল দরশন।।"[৯৩]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'ভরার মেয়ের গান' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে ঘটক বৃত্তির কথা উল্লেখ করেছন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ঘটকবৃত্তি অবলম্বন করে বহু মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন। অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার একটি ছত্রে ভরার মেয়ের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

"ভরাপাড়া ভরার ঘটক রে—
আরে ঘটক ট্যাকা কড়ি খাইয়া।
বৈদেশে গাররের ঘরে—
আমারে দিছে বিয়া।।"[৯৪]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'মানিকতারা ডাকাইত' পালায় পালা রচয়িতা সেখ আমির উদ্দিন লোকবৃত্তি হিসাবে মাছধরা এবং চুরি করার কথা উল্লেখ করেছেন। পালা রচয়িতা সেখ আমির উদ্দিন দেখিয়েছেন জেলেরা মাছ ধরে এবং কোচরা চুরি করে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। পালার ছত্রে কবি তা উল্লেখ করেছেন—

"বাড়ির কাছে জাইল্যা পাড়া, আর আছে কোচার।
ইষ্টি কুটুম সরিক সরাত কেউ নাইঙ্কাতার।।"[৯৫]

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা সেখ আমির উদ্দিন কবিরাজ বৃত্তির উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য পালায় আমরা দেখতে পাই ডাকাতি বৃত্তি অবলম্বন করে বাসু রাতারাতি ধনসম্পত্তির মালিক ওঠে। তার মা এসব দেখে জ্বরে আক্রান্ত হলে বাসু কবিরাজ কে খবর দেয়। কবিরাজ এসে বেলের ছাল, মৌরী ভিজানো জল, নিমপাতা ইত্যাদি দিয়ে বড়ি তৈরী করে বাসুর মাকে খেতে দেয়। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে তা উল্লেখ করেছেন —

"বাসুর বাড়ি যায়্যা কইল কবিরাজ তিনকড়ি।
তোমার মাও যে ভালো হইব খাইলে চাইরডা বড়ি।।"[৯৬]

'মানিকতারা ডাকাইত' পালা রচনার সমসাময়িক কালে দেশের শাসনতান্ত্রিক অবস্থা অত্যন্ত শিথিল ছিল। পালার একাধিক ছত্রে ডাকাতি বৃত্তি অবলম্বন করে বাসু, মানিক, কালু, দুলু, কানু, প্রভৃতি ডাকাত জীবন নির্বাহ করেছে। একসময় ডাকাত দলের সর্দার মারা গেলে ডাকাত দলের সদস্যদের অবস্থা করুণ থেকে করুণতর হতে থাকে। তাদের পেটে আর অন্ন জুটছে না—এমন অবস্থায় তারা বাসুকে ডাকাতদলের সর্দার হতে বলল।

পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন—

"উপায় একডা কও ছরদার কেম্‌নে আমরা বাঁচি।
বাল বাচ্চা লয়্যা আমরা বড়ো দুঃখে আছি।।"[৯৭]

এই খণ্ডের 'নেজাম ডাকাইত পীরের কেরামতি' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে মিষ্টি প্রস্তুত করার কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি সেখ ফরিদ একসময় নেজাম ডাকাতকে নিয়ে এক হালুয়ানী বা মিষ্টি প্রস্তুতকারিনীর কাছে রেখে যায়। হালুয়ানী কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা সে প্রসঙ্গে বলেছেন—

"দরিয়ার পরপারে বাজারের পিছে।
মিডাই বেচিতে এক হালুয়ানী আছে।।
ছেমাই পিডা বেচে বুড়ি ছছি পিডা কত।
খালা বুলি তারে সবে ডাকে অবিরত।।"[৯৮]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পঞ্চম খণ্ডের প্রথম পালা 'কমল সদাইগরের পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে গাওয়াল বৃত্তি বা গ্রামে গ্রামে পণ্য ফিরি করে জীবন ধারণের কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি ধরমপুর গ্রামের বানিয়া ধর্মমণি, গ্রামে গ্রামে পণ্য ফিরি করে জীবিকা অর্জন করে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এই গাওয়াল বৃত্তির উল্লেখ করেছেন —

" ধরমপুর গেরামে আছিল বানিয়া একঘর।
গাওয়াল করি জুটাইত ভাত আর কাপড়।।"[৯৯]

এই পালার অন্যত্র আমরা লোকবৃত্তি হিসাবে মাছ বিক্রি করে জীবন ধারণের কথা জানতে পারি। পালা পাঠ করলে আমরা জানতে পারব যে সূর্যমণিকে যে সমুদ্রের জলে দস্যুরা ফেলে দিয়েছিল সেই সমুদ্রের চরের কাছে এক মাছ বেচনীর ঘর ছিল। এই মাছ বেচনী সকালবেলা সমুদ্রের চর থেকে অচৈতন্য সূর্যমনিকে উদ্ধার করেছিল। পালা রচনার সমসাময়িক কালে মাছ বিক্রয় করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে তা উল্লেখ করেছেন—

''চরের কাছে আছিল এক মাছ বেচনীর ঘর।
পরভাতে আইল নারী সেইনা বালুর চর।।"[১০০]

এই খণ্ডের 'কবরের কান্না' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে ডাকাতি করা বা নৌকার মাঝি বৃত্তি গ্রহণের উল্লেখ করেছেন। পালার ছত্রে পালা রচয়িতা দেখিয়েছেন হার্মাদ নামক জলদস্যুরা কিভাবে নৌকার মাঝি এবং সাধারণ মানুষদের উপর অত্যাচার করে তাদের যথাসর্বস্ব লুটতরাজ করে নেয়। পালার ছত্রে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"লুডতরাজ করে তারা করে দাগাবাজি।
সাইগরে হার্মাদ্যার ডরে কাঁপে নায়েরমাঝি।।"[১০১]

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে কৃষিকাজের উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি হার্মাদ দস্যুরা যখন নুবন্নেছা-মালেককে জোর করে ধরে নিয়ে গেল তখন নুরন্নেছার পিতা আজগর কাঁদতে লাগল। এই আজগর কৃষিকাজ কে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে তা উল্লেখ করেছেন—

"কাঁদিত লাগিল হায় রে বুড়া ক্ষেতিয়াল।
সুখের সংসার তার হইল বেনাল।।" [১০২]

এই পালার আর একটি ছত্রে পালা রচয়িতা লোক বৃত্তি হিসাবে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহের উল্লেখ করেছেন। হার্মাদ দস্যুরা নুরন্নেছাও মলেক কে ধরে নিয়ে সুমদ্র পাড়ি দিচ্ছিল। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় পালের দড়ি ছিঁড়ে নৌকা ঘুরতে ঘুরতে বালির চরে জেলেদের নৌকার কাছে গিয়ে ওঠে। জেলেরা হার্মাদ দস্যুদের চোখে মরিচ গুঁড়ো দিয়ে মালেক ও নুরন্নেছাকে উদ্ধার করল। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লোকবৃত্তি হিসাবে মাছ ধরার কথা বলেছেন—

"গাছ গাছালী নাইরে সেই ধূ ধূ বালুর চরে।
কয়েকজন জাইল্যা তথায় সাইগরে মাছ ধরে।।" [১০৩]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ষষ্ঠ খণ্ডের 'ভেলুয়া সুন্দরী মদন সাধু'র পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে ঘটক বৃত্তির উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, পুত্র মদনের বিবাহের জন্য মুরারি সাধু কাঞ্চন নগরে মানিক সদাগরের কন্যা ভেলয়াসুন্দরীর উদ্দেশ্যে ঘটক পাঠায়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ঘটকবৃত্তি অবলম্বন করে অনেকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে ঘটক বৃত্তি অবলম্বন করে যে অনেকে জীবনধারণ করতেন, পালা রচয়িতা পালার ছত্রে তা দেখিয়েছেন—

"হীরামনি মাণিক্য আর ডিঙ্গা ভইরা ধন।
ঘটক পাঠাইল সাধু পুত্রের বিয়ার কারণ।।" [১০৪]

এই খণ্ডের 'মলয়া কন্যার পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে ডাকাতি করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র একধিক পালায় লোকবৃত্তি হিসাবে ডাকাতি করার কথা বারবার উঠে এসেছে। পালা রচনার সমসাময়িক কালে ডাকাতি বৃত্তি গ্রহণ করে অনেকে জীবন ধারণ করতেন। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে তার উল্লেখ করেছেন—

"হারমাদ ডাকাইত এক নবরঙ্গপুরে।
ডাকাইতি করিয়া বেটা খাইত নগরে।।" ১০৫

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'হাতি খেদার গান' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে, গরু মহিষ পালন, জুমচাষ এবং বেতের লাঠি বা ছাতার বাঁট তৈরী করে জীবন জীবিকা নির্বাহের কথা বলেছেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে মানুষ নিশ্চয়ই এই বৃত্তি গ্রহণ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতেন। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বহু মানুষ এভাবে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে আলোচ্য লোকবৃত্তি গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন—

"ঘরত আছে গরু মহিষ আর বাইরে জোমর ক্ষেত।
বচর বচর হাজার ট্যাহার বেচে গল্লাক বেত।।" [১০৬]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সপ্তম খণ্ডের 'রতন ঠাকুরের পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে ফুলের মালা বিক্রি করে উপার্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহের কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি বৃদ্ধ মালীর কন্যা ফুল তুলে মালা গাঁথে এবং বৃদ্ধমালী তা হাটে নিয়ে বিক্রি করে জীবনধারণ করে। বর্তমানে বহু মানুষ ফুলের মালা বিক্রয় করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে ফুলের মালা গেঁথে তা হাটে বিক্রয় করে মানুষ যে জীবন ধারণ করতেন পালা রচয়িতা পালার ছত্রে তার

উল্লেখ করেছেন—

''শুন শুন বাপ আরে কহি যে তোমারে।
এই মালা বিকায়্যা আইবা কাহনার দরে।।
মালা লয়্যা বির্দ্ধমালী হাটে চইলা যায়।
একলা ঘরে শুইয়া কইন্যা সুখে নিদ্রা যায়।।''[১০৭]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'হরিণ কুমার জিরালনী কন্যার পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে ঝিনুক থেকে মুক্তা সংগ্রহ করে বিক্রি করে জীবন ধারণের কথা ও বলেছেন। বৈমাত্রেয় ভাই, জিরালনী কন্যাকে বিবাহ করতে চাইলে জিরালনী মন পবনের নাও-এ উঠে গভীর নদীবক্ষে আত্মবিসর্জন দেয়। এই সময় ভাটি বাঁকে এক নিসন্তান জেলে ও জেলেনি অচৈতন্য অবস্থায় জিরালনী কন্যাকে উদ্ধার করে নিজেদের গৃহে নিয়ে আসে। এই জেলে জেলেনি মাছ ধরে, ঝিনুক থেকে মুক্তা সংগ্রহ করে বিক্রয় করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। পালা রচয়িতা পালার একটি ছত্রে এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"ভাটি বাঁকে বইসা ভালা জাইলা আর জাইলানী।
ঝিনইয়ের মুক্তা লয়্যা তারা করে বেচাকিনি।।''[১০৮]

এই খণ্ডের 'সন্নমালার পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবৃত্তি হিসাবে ব্যবসা বাণিজ্যের উল্লেখ করেছেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে ব্যবসা বাণিজ্যকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে বহু মানুষ তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতেন। বনবাসী সন্নমালা একদিন বনের নিকটবর্তী বড়ো নদী দিয়ে সদাইগরের সাত ডিঙ্গা যেতে দেখল। এ প্রসঙ্গে পালার একটি ছত্রে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"সাই সদাইগর যায় বাণিজ্যির কারণে।
সাত ডিঙ্গা সদাইগর ভইরা লইছে ধনে।।
সাত ডিঙ্গা ধন সাত মাসের খোরাক।''[১০৯]

এই খণ্ডের ''কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ'' পালার রচয়িতা কবি চন্দ্রাবতী লোকবৃত্তি হিসাবে একই সঙ্গে নদীতে মাছ ধরে এবং নদীতে খেয়া পারাপার করে জীবনধারণের কথা উল্লেখ করেছেন। পালার একটি ছত্রে পালা রচয়িতা কবি চন্দ্রাবতী -এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"মিথিলা নগরে আছিল গো দুঃখী, মাধব জালিয়া।
জাল বায় মাছ ধরে গো ঘাটে দেয় খেওয়া।।''[১১০]

আলোচ্য লোকবৃত্তি সম্পর্কে অনুমান করা যায় যে পালা রচনার সমসাময়িক কালে সমাজের অনেকেই নদীতে মাছ ধরে এবং নদীতে খেয়া পারাপার করে অতিকষ্টে জীবন জীবিকা নির্বাহ করত।

———

(ঙ) লোকপোষাক

সভ্যতার সূচনা লগ্নে অরণ্যচারী আদিম মানুষ শুধুমাত্র খাবারের সন্ধানে বন থেকে বনান্তরে সমস্ত রকম বিপদকে উপেক্ষা করে ঘুরে বেড়িয়েছে। এসময় মানুষ পোষাক ও বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। আত্মরক্ষার জন্য মানুষ গাছের ডালে রাত কাটিয়েছে। পরবর্তীকালে সভ্যতার ক্রমবিকাশে অরণ্যচারী মানুষ পোষাক ও বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। এ সময় গহাবাসী মানুষ লজ্জা নিবারণের জন্য গাছের

বাকল ও লতাপাতাকে পোষাক হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এরপর সভ্য সংস্কৃতির বিকাশে সমাজবদ্ধ মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যে তিনটি সামগ্রীর (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান) প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল পোষাক-পরিচ্ছদ। শীত ও গ্রীষ্মের তারতম্য অনুযায়ী শীতপ্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষের ব্যবহার্য পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা হয়ে থাকে যে, লোকপোষাক আঞ্চলিকতার আবর্তে আবর্তিত। ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের উপর ভিত্তি করে আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী সমাজে বসবাসকারী একশ্রেণীর মানুষ লোক পোষাকগুলি প্রস্তুত করেন।

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র বিভিন্ন পালায় যে লোক পোষাকের প্রসঙ্গ আছে তার যাবতীয় বিবরণই নারীর দিক থেকে বর্ণিত। শ্রদ্ধেয় মৌলিক মহাশয় দীর্ঘ সময় ধরে মৈমনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর জেলা থেকে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পালা গুলি সংগ্রহ করেছেন। আর সেকারণেই উক্ত অঞ্চলগুলির পোষাক পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য পালাগুলিতে পরিলক্ষিত হয়। সূক্ষ্মতার কারণে ঢাকার মসলিন শাড়ি জগৎ বিখ্যাত। ঢাকা থেকে এই মসলিন শাড়ি কৃষ্ণসাগর পার হয়ে ইউরোপে যেত। মৈমনসিংহের শাড়ির প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে পল্লীকবি জসীমউদ্দিন তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন—

> *"প্রায় ২৫ বৎসর আগে আমি ময়মনসিংহের গ্রামগুলি হতে কতকগুলি শাড়ির নাম লিখে এনেছিলাম। আজকাল সূতার অভাবে এই শাড়িগুলি ওদেশের তাঁতিরা এখনো তৈরি করে কিনা জানিনা। শাড়িগুলির নাম শুনলে কান জুড়িয়ে যায়। নিম্নে শাড়ির নামগুলি লিখে দিচ্ছি ঃ*
>
> *কাদিরের শাড়ি, কালপিন, বাঙ্গনীগরদ, গালপাইড়, কুনারি, জলে-ভাসা, একপাছুল্লা, কাচপাইড়, জামদানী, জামের শাড়ি, ফরাসী শাড়ি, বাশিপাইড়, চোদ্দরসী, কাকড়ার ছোপ, আয়নাফোটা, সোনুঝুরি, গোলাপ ফুল, কুসুমফুল, বাওইঝাক, রাসমণ্ডল, লক্ষ্মীবিলাস, কৃষ্ণনিলাম্বরী, মধুমালা, কলমীতলা। দেশে যখন প্রচুর অন্ন ছিল, তখন এই শাড়িগুলি অঙ্গে জড়িয়ে কৃষাণ বধূরা আমাদের পাড়াগাঁগুলিকে অপূর্ব সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে পরিণত করত।"*[১১১]

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সাতটি খণ্ডের বিভিন্ন পালায় যে সমস্ত লোক পোষাকের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে নিম্নে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল—

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডের প্রথম পালা 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায় পালা রচয়িতা দ্বিজ কানাই লোকপোষাক হিসাবে উদয়তারা শাড়ির নামোল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, হুমরা বেদে ঘুমে অচৈতন্য নদ্যার চাঁদকে হত্যা করার জন্য মহুয়ার হাতে ছুরি তুলে দেয়। কিন্তু মহুয়া তাকে হত্যা না করে দুজনে পলায়ন করে। তারা ছুটতে ছুটতে নদীর তীরে এসে এক সাধুর নৌকায় এসে হাজির হয়। এদিকে সাধু মহুয়ার রূপ দেখে পাগল হয়ে নদ্যার চাঁদকে নদীর জলে ফেলে দেয়। এসময় মহুয়ার মন পাওয়ার জন্য সাধু বলে—

> *"উদয়তারা শাড়ী দিবাম লক্ষ টাকা মূল।*
> *হীরামনি দিয়া তোমার জুইরা দিবাম চুল।।"*[১১২]

অনুমান করা যায় যে পালা রচনার সমসাময়িক কালে নারীরা লোকপোষাক হিসাবে উদয়তারা শাড়ি

পরত।

এই খণ্ডের 'সুন্দরী মলুয়া' পালায় পালা রচয়িতা লোক পোষাক হিসাবে পাটের শাড়ির কথা বলেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, মলুয়ার সঙ্গে চাঁদবিনোদের বিবাহের পর কাজীর কুদৃষ্টি মলুয়ার উপর পড়ে। মলুয়ার রূপে আকৃষ্ট হয়ে কাজী অপমাণিত হলে নতুন বিবাহের নজর মরেচা হিসাবে পাঁচশত রৌপ্য মূদ্রা দাবী করে। চাঁদবিনোদ তা দিতে না পারায় কাজী তার জমিও বাড়ি বাজেয়াপ্ত করে। এসময় নিদারুণ দুঃখ কষ্টের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"হাতের বাজু বান্ধা দিয়া ভাদ্রমাস যায়।
পাটের শাড়ী বেইচ্যা মলুয়া আশ্বিন মাস খায়।।" [১১৩]

এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে নারীরা লোক পোষাক হিসাবে পাটের শাড়ী পরিধান করত।

এই খণ্ডের 'আয়না বিবির পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা নারীর অতি পরিচিত ও প্রচলিত পোষাক হিসাবে আশমানতারা শাড়ীর নামোল্লেখ করেছেন। উজ্জ্যাল সাধুর সঙ্গে আয়না বিবির বিবাহের পর উজ্জ্যাল সাধু হাটে গিয়ে আয়না বিবির জন্য কী কিনে আনবে? সে প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"উজ্জ্যাল সাধু হাটে যায়রে কিইন্যা আনব কি।
আয়নার লাইগা আন্‌ব সাধু আসমান তারা শাড়ী।। [১১৪]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে নারীর পোষাক হিসাবে আসমান তারা শাড়ির প্রচলন ছিল।

এই পালার অন্যত্র উজ্জ্যাল সাধু আয়না বিবিকে এক নদীর চরে নির্বাসন দিলে যেখানে কুরুঞ্জিয়া জাতির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এদের সহযোগিতায় আয়না বিবি কুরুঞ্জিয়া রমণীর বেশে চান্দের ভিটায় উজ্জ্যাল সাধুর বাড়ির সন্ধান পায়। এই সময় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা আয়নাবিবির পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

"আগাড়ুরি পাটের গাছা
আরে ভালা কোমরে বান্ধিয়া।
খোপা তো বান্ধিল কন্যা
আরে ভালা উবদা করিয়া।।" [১১৫]

উপরোক্ত ছত্রগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে কুরুঞ্জিয়া সম্প্রদায়ের নারীরা রঙিন ডোরাকাটা পাটের শাড়ি পরত এবং চুল উল্টো করে খোপা বাঁধত,

এই খণ্ডের 'শ্যাম রায়ের পালা'য় পালা রচয়িতা নিতাই চাঁদ নারীর পোষাক হিসাবে পবনবাহার শাড়ির কথা বলেছেন। রাজা শ্যাম রায় এক ডোমনারীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহ করে। পালা রচয়িতা নিতাই চাঁদ পালায় উল্লেখ করেছন যে, ডোমনারী রঙিন মোটা পাটের শাড়ি পরত। কিন্তু শ্যাম রায়ের সঙ্গে বিবাহের পর তার পোষাক পরিচ্ছদের পরিবর্তন ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"বাইছা গুইছ্যা আইনাছে শাড়ী পবনবাহার" [১১৬]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পালা 'কাঞ্চন কন্যা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক পোষাক হিসাবে অগ্নিপাটের শাড়ির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। পালাটি পাঠ করে আমরা জানতে পারি, তমসা গাজী বাণিজ্য

করে ফেরার পথে কাঞ্চন কন্যার জন্য অগ্নিপাটের শাড়ি কিনে নিয়ে আসে। অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন—

"আর ত আইনাছে কিইনা অগ্নিপাটের শাড়ী।
আর ত আইনাছে কিইনা কোমরের ঘুঙ্গুরি।।" [১১৭]

এই খণ্ডের 'রাজকন্যা রূপবতী' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক পোষাক হিসাবে ধুতি ও শাড়ীর কথা উল্লেখ করেছেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে পালার গায়েন পালাগান করলে উপহার হিসাবে তাকে নানা দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে ধুতি ও শাড়ী দেওয়া হত। এই ধুতি ও শাড়ী বাঙালির ঐতিহ্যমণ্ডিত গর্বের পোষাক। পালা রচয়িতা পালার একটি ছত্রে এ সম্পর্কে বলেছেন—

"এই গাহান গাইলাম রে ভাই ভগ্যিমানের বাড়ী।
এক জোড়া ধুতি চাই আর একখান শাড়ী।।" [১১৮]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'সদাগর কন্যা বগুলা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক পোষাক হিসাবে অগ্নিপাটের শাড়ির কথা বলেছেন। বগুলাকে পাওয়ার আসায় রাজার পুত্র অগ্নিপাটের শাড়ি ও রত্ন অলঙ্কার প্রদানের কথা বলেছে। পালার ছত্রে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"তোমার লাইগ্যা সাজাই কন্যা জোড় মন্দির ঘর।
অগ্নিপাটের শাড়ী কত রত্ন অলঙ্কার।।" [১১৯]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই খণ্ডের কাঞ্চন কন্যা পালা'য় ও পালা রচয়িতা এই অগ্নিপাটের শাড়ীর উল্লেখ করেছেন। মৈমনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে আজ ও এই শাড়ী লোকপোষাক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এই খণ্ডের 'আমিনা বিবি ও নছর মালুম' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক পোষাক হিসাবে নারীদের আড়াই হাত খামি অর্থাৎ নতুন কাপড় পরার কথা বলেছেন এবং এঙ্গি বা বক্ষাবরণ জামা পরার কথা বলেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি দক্ষিণ মুলুকে সাগরের তীরে অঙ্গি নামক শহরে নছর মালুম মোকাম স্থাপন করে নানা কারবার শুরু করে। এখানকার নারীদের লোক পোষাক সম্পর্কে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"এক পেঁচে কাপড় পিঁধে আঢ়াই হাত খামি।।
মাথার চুল বাবরি ছাঁটা এঙ্গি থাকে বুকে।" [১২০]

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোক পোষাক হিসাবে পুরুষের তহমান অর্থাৎ লুঙ্গি এবং কুর্তা পরিধানের কথা বলেছেন। আমিনাকে রেখে নছর মালুম বাণিজ্যে চলে গেলে নামজাদা ধনী ব্যক্তি এছাক আমিনার রূপে আকৃষ্ট হয়। এই এছাকের পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনা দিতে গিয়ে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"পইরণেতে তহমান কালা কুর্তা গায়।
মাথার উপর টুপি দিয়া আয়না ধরি চায়।।" [১২১]

এই একই পালার অন্য একটি ছত্রে পালা রচয়িতা লোকপোষাক হিসাবে চুলি অর্থাৎ নারীর বক্ষাবরণ জামার কথা বলেছেন। নছর বাণিজ্যে গিয়ে ছয় বছর অতিক্রান্ত হলেও না ফিরলে এছাক মিঞা আমিনা কে বন্দী করতে চাইলে আমিনা নিজের পোষাক পরিবর্তন করে ছদ্মবেশ ধরে পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়ার আগে আমিনার পোষাক সম্পর্কে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"রঙ্গিনা ছাট্টিনের চুলি আর নাকর নথ।
ফেলিয়া গিয়াছে কইন্যা ঘরর দুয়ারত।।" [১২২]

'প্রাচীন পুর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডের 'ভেলুয়া সুন্দরী-আমির সাধু' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা আমির সাধুর পোষাকের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

"অপরূপ সোন্দর সাধু আচানক সাজ।
মাথার উপর আছে রে তার হাজার টাকার তাজ।।
কাশ্মীরী শালের জামা পিনুনে চিকন্ ধুতি।
পায়ের মাঝে লাগাই দিছে ভালা চীনার জুতি।।" [১২৩]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আমির সাধুর যে লোকপোষাক পালা রচয়িতা দেখিয়েছেন তা বর্তমান সমাজজীবনে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানে ব্যবহার হতে দেখা যায়।

এই পালার অপর একটি ছত্রে পালা রচয়িতা লোকপোষাক হিসাবে শাড়ী ও চাদরের কথা বলেছেন। আমির সাধু বাণিজ্য যাত্রা করতে চাইলে, ভেলুয়া সুন্দরী সমস্ত অলঙ্কারাদি সহ পোষাক পরিচ্ছদ বিক্রি করে সংসার চালানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। এতদ্সত্ত্বে ও মা-বাবা বোনের রোষে আমির সাধুকে বাণিজ্যে যেতে হয়। পালা রচয়িতা পালার একটি ছত্রে বলেছেন—

"ন যাইও ন যাইও তুমি ছাড়ি আমার ঘর
পিন্ধনে শাড়ী বেচ্যম সোনালী চাদ্দর।।" [১২৪]

প্রসঙ্গতঃ এই শাড়ীও চাদর বাঙালি নারী মাত্রেরই অতি পছন্দের লোকপোষাক।

এই একই পালার অন্য একটি ছত্রে পালা রচয়িতা লোকপোষাক হিসাবে লুঙ্গি ও টুপি ব্যবহারের কথা বলেছেন। আমির সাধু বহু অর্থোপার্জন করে শাফলা বন্দরের ঘাটে নেমে নিজের বাড়ি ফিরে জানতে পারে ভেলুয়া সুন্দরী মারা গছে। এরপর ভেলুয়া সুন্দরী যে মরিনি—একথা জানতে পেরে আমির সাধু তার সদাগরী পোষাক ত্যাগ করে ফকিরের বেশে ভেলুয়ার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার একটি ছত্রে বলেছেন—

"জরির তাজ রেশমী লুঙ্গি ছাড়িল আমির।
বাড়ীঘর ছাড়িয়ারে হইল ফকির।।" [১২৫]

প্রসঙ্গতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিম সম্প্রদায়ে মানুষ জরির টুপি ও রেশমী লুঙ্গি পোষাক হিসাবে ব্যবহার করেন।

এই খণ্ডের 'কমলা কন্যার পালা'য় পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান লোক পোষাক হিসাবে নারীর অগ্নিপাটের শাড়ীর কথা বলেছেন। 'কমলা কন্যার পালা'য় কমলার অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান বলেছেন—

''অগ্নিপাটের শাড়ী কন্যা যখন নাকি পরে।
স্বর্গের তারা লাজ পায় দেখিয়া কন্যারে।।" [১২৬]

প্রসঙ্গতঃ 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের 'সদাগর কন্যা বগুলা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা অগ্নিপাটের শাড়ীর কথা উল্লেখ করেছেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আজও এই শাড়ীর প্রচলন লক্ষিত হয়।

‘কমলা কন্যা পালা’র অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকপোষাক হিসাবে আসমানতারা শাড়ীর কথা বলেছেন। অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে কমলা ও প্রদীপ কুমারের বিবাহ সম্পন্ন হল। এই বিবাহ সভায় কমলা কন্যার পোষাকের বর্ণনা দিতে গিয়ে পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান বলেছেন—

‘‘তারপর পরাইল শাড়ী নামে আশমানতারা।
ভূমেতে থইলে শাড়ী ভুই আশমানপারা।।’’[১২৭]

এই খণ্ডের ‘কাফেন চোরা’ পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক পোষাক হিসাবে নারীর রঙিন সাটিন কাপড়ের বক্ষাবরণ জামার কথা উল্লেখ করেছেন। আয়রা, নদীতে স্নান করতে যাওয়ার সময় যে পোষাক পরিধান করেছেন বর্তমানে তা লোক পোষাক হিসাবে প্রচলিত। লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে চুলি অর্থাৎ বক্ষাবরণ জামা আসলে বর্তমানের ব্লাউজের পূর্বনাম। আয়রা যে পোষাক পরেছে তা বর্তমানে আনারকলি পোষাক হিসাবে লোকসমাজে প্রচলিত। পালা রচয়িতা আয়রার পোষাকের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

‘‘রঙিনা সাটিনের চুলি পরিয়াছে গায়।
নতুন আনারের কলি আল্‌গে দেখা যায়।।’’ [১২৮]

এই খণ্ডের ‘সুনাই সুন্দরী পালা’য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকপোষাক হিসাবে নারীর নীলাম্বরী শাড়ীর কথা বলেছেন। সুনাই সুন্দরীর বিবাহ উপলক্ষে সুনাই এর মামা তাকে নীলাম্বরী শাড়ী কিনে দেয়। পালা রচনার সমসাময়িক কালে এই শাড়ীর যথেষ্ট সুনাম ছিল। আজও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এই নীলাম্বরী শাড়ীর প্রচলন আছে। পালা রচয়িতা এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

‘‘মামায় তো দিয়াছে কিন্যা রে
শাড়ী পাছা নীলাম্বরী।’’ ১২৯

‘সুনাই সুন্দরী পালা’র অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকপোষাক হিসাবে অগ্নিপাটের শাড়ীর নাম উল্লেখ করেছেন। জমিদার পুত্র মাধব, সুনাই সুন্দরীর রূপ লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে সুনাইকে যে চিঠি লেখে সেখানে অগ্নিপাটের শাড়ীর উল্লেখ আছে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

“বাপের আছে ধন দৌলত
লাখের জমিদারী।
তোমারে দিয়াম লো কন্যা
আমি অগ্নিপাটের শাড়ী।।’’ [১৩০]

এই খণ্ডের ‘শীলা দেবীর পালা’য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক পোষাক হিসাবে নারীর মেঘডুম্বুর শাড়ীর কথা উল্লেখ করেছেন। পরগণার রাজার পুত্র ও রাজকন্যা শীলার বিবাহ উপলক্ষে শীলাকে নানা অলংকার সহ মেঘডুম্বুর শাড়ী পরানো হয়। এই শাড়ী প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার একটি ছত্রে বলেছেন—

“সোনার তার বাজুয়া হার যতনে পরাইল।
মেঘডুম্বুর শাড়ী পরায়্যা সোনার অঙ্গ যে ঢাকিল।।’’ [১৩১]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে এই শাড়ীর যথেষ্ট সুনাম ছিল। বর্তমানে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এই শাড়ীর প্রচলন আছে।

‘প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা’র চতুর্থ খণ্ডের ‘রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই’ পালায় পালা রচয়িতা লোক

পোষাক হিসাবে বাঙালির চিরপরিচিত ধুতি ও চাদরের কথা উল্লেখ করেছেন। রঙ্গমালা সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় রাজচন্দ্র যে পোষাক পরেছে সে সম্পর্কে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"সোনালী জরির ধুতি তেপেঁচি পিন্ধিল।
গোলাবী চাদ্দর খুলি কান্দে জড়াইল।।
জুরির জুতা পায়ত্ দিয়া সাজিল নাগর।।" [১৩২]

এই খণ্ডের 'মানিকতারা ডাকাইত' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক পোষাক হিসাবে নারীর অগ্নিপাটের শাড়ীর কথা উল্লেখ করেছেন। পালা রচয়িতা পালার একটি ছত্রে এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"শাল দেশোলা গরদ আর অগ্নিপাটের শাড়ী
সোনার বাটি আাবের কাকোই সোনার আছাড়ি।।" [১৩৩]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বর্তমানে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যেমন অগ্নিপাটের শাড়ীর প্রচলন আছে তেমনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শালও গরদের শাড়ীর প্রচলন আছে।

এই 'মানিকতারা ডাকাইত' পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা বাঙালির অতি পরিচিত লোকপোষাক ধুতি ও চাদরের উল্লেখ করেছেন। তিন ক্রোশ দূরে মাইন্দা গ্রামে সাধুশীলের কন্যা মানিকতারাকে বিবাহের জন্য রওনা হওয়ার সময় বাসু নাপিত যে পোষাক পরেছে সে সম্পর্কে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"রাইত পোযাইলে বাসু নাই ধুতি চাদ্দর লইয়া।
চৈত মাইস্যা রৈদে চলে মাথায় চাদ্দর দিয়া।।" [১৩৪]

এই খণ্ডের 'নেজাম ডাকাইত পীরের কেরামতি' পালাদ্দ অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক পোষাক হিসাবে কামিজ, কুর্তা ও শালের উল্লেখ করেছেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে ব্যবহৃত লোকপোষাকগলি বর্তমান লোকসমাজের আজও প্রচলিত। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, নেজাম ডাকাতের প্রচুর টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বে ও সে দিনের বেলা মানুষের সামনে বের হতে পারে না। তাই সে নিজের খাবার, পোষাক কিছুই কিনতে পারে না। ফকির সেখ ফরিদকে তাই নেজাম ডাকাত বলছে—

"কোথায় পাইব ভালা খাওন কামিজ, কুর্তা, শাল।
হাডে বাজারে না যায় নেজাম দিনে ছিরগাল।।" [১৩৫]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পঞ্চম খণ্ডের 'কমল সদাইগর পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকপোষাক হিসাবে অগ্নিপাটের শাড়ীর উল্লেখ করছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি সোনাই তার সতীন পুত্র চান্দমনি ও সূর্যমনিকে হত্যা করবার জন্য মইফুলাকে ডেকে অলঙ্কারাদি দ্রব্যসামগ্রী ও অগ্নিপাটের শাড়ী দিতে চায়। মইফুলা অবশ্য সোনাই এর এই কুপ্রস্তাবে রাজি হয় নি। মইফুলাকে দ্রব্যসামগ্রী দেওয়া প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"অগ্নিপাটের শাড়ী দিল দেখিতে সোন্দর।
শাড়ীর গিরায় বান্দি দিল দুইডা মোহর।।" [১৩৬]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পালারচনার সমসাময়িক কালে অগ্নিপাটের শাড়ীর বেশ সুনাম ছিল। গীতিকার একাধিক পালায় পালা রচয়িতাগণ অগ্নিপাটের শাড়ীর উল্লেখ করেছেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আজ ও এই শাড়ীর প্রচলন আছে।

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান সখিনা বিবি'র পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকপোষাক হিসাবে আসামানতারা শাড়ী এবং রঙিন সাটিন কাপড়ের কাঁচুলি ও মস্‌লিনের চুলি অর্থাৎ বক্ষাবরণী জামার কথা উল্লেখ করেছেন। ফিরোজ খাঁ যুদ্ধ জয় করে ফিরলে সখিনা বিবি ফুলের মালা পরিয়ে তাকে সম্মান জানাবে। এই উপলক্ষে সখিনা নিজের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে দরিয়াকে বলেছে—

"আমার পইরণের লাইগা আশমানতারা শাড়ী।
সাট্টিনের কাঁচলি আর মস্‌লিনের চুলি।।[১৩৭]

এই খণ্ডের 'পরীবাণু বেগমে'র পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকপোষাক হিসাবে শৌখিন কাপড়ের উপর কারুকার্য খচিত চুমকির কাজ করা শাড়ীর উল্লেখ করেছেন। সুজা বাদ্‌শা তাঁর আওরত পরীবাণু বেগমকে হাতির পিঠে বসিয়ে পাহাড়ী পথ ধরে দক্ষিণ দিকে যাওয়ার সময় পরীবাণু যে পোষাক পরে ছিল সে সম্পর্কে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"মুড়ার পন্থ ধরি তারা দহিন মিক্যে যায়।
পিন্ পিন্ পিন্ শাড়ী পরীর বয়ারে উড়ায়
চুম্‌কি বাদ্‌লা কত শাড়ীর পরে ঝরি ঝরিরে।।"[১৩৮]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে চুমকি ও জরির কাজ করা শাড়ী শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আজ ও প্রচলিত আছে।

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'সুজা -তনয়ার বিলাপ' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকপোষাক হিসাবে খামির কথা বলেছেন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মহিলাদের প্রধান পরিধেয় বস্ত্রকে আরাকান অঞ্চলে খামি বলা হয়। এই খামি অনেকটা পুরুষের লুঙ্গির মতো। মহিলারা বুকের উপর নানা রঙের খামি পরত। রোসাং শহরে বাণিজ্য করতে এলে মইঘ্যা রাজা , সুজা তনয়াকে যে পোষাক পরতে দিয়েছিল সে সম্পর্কে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"রাইতে দিনে চোগর পাণিত্ বালুশ ভিজাই আমি।
পিনবার লাগি মইঘ্যা রাজা দিয়ের্ কালা খামি।।" [১৩৯]

এই খণ্ডের 'ছুরত জামাল-অধুয়া সুন্দরী' পালায় পালা রচয়িতা ফৈজু ফকির লোকপোষাক হিসাবেপাটের শাড়ী ও নীলাম্বরী শাড়ীর উল্লেখ করেছেন। মাঝি মাল্লা সহ ছুরত জামাল অধুয়ার ঘাটে এসে হাজি হলে, অধুয়া সুন্দরী তার সখীদের সঙ্গে নিয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হয়। এ প্রসঙ্গে অধুয়া সুন্দরী ও তার সখীদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে পালা রচয়িতা ফৈজু ফকির বলেছেন—

"কারও পিন্ধনে পাটের শাড়ী কারও নীলাম্বরী।
আইল নদীর ঘাটে যতেক সুন্দরী।।"[১৪০]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ষষ্ঠ খণ্ডের 'হাতি খেদার গান' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক পোষাক হিসাবে খামির (লুঙ্গির মতো পোষাক, তবে তা বুকের উপরে পরা হয়) উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পঞ্চম খণ্ডের 'সুজা তনয়ার বিলাপ' পালায় লোক পোষাক হিসাবে এই খামির উল্লেখ আছে। 'হাতি খেদার গান" পালায় জুম্মা চাউম্মার মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বলেছেন—

"পইরণে এক পেঁচর খামি আড়াই হাতর মাপ।
ন মানে যে ভাই-বেরাদর ন মানে মাও বাপ।

বুগর উয়র ধইয়া বেড়াই মাথা রাইখ্যে খোলা।
বে-পর্‌দা জুম্মা চাউম্মার যত মাইয়া-পোলা।।'' [১৪১]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে জুম্মা-চাউম্মা সম্প্রদায়ের মেয়েরা আড়াই হাত মাপের লুঙ্গির মতো বক্ষাবরণী পোষাক 'খামি' পরত। তাদের মাথায় ঘোমটা থাকত না তবে বুকের উপর থাকত একটি ধইয়া অর্থাৎ গামছা। বর্তমানে লোকসমাজে প্রায় সর্বত্র গামছার ব্যবহার লক্ষণীয়।

এই খণ্ডের অন্তর্গত ''মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'' পালায় পালা রচয়িতা সুলা বা সুলোচনা বালক শ্রীকৃষ্ণের পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনা দিয়েছেন। কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাওয়ার আগে মা যশোদা কৃষ্ণকে নানা বস্ত্র আভরণে সাজিয়ে দিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"মুছাইয়া সর্বঅঙ্গ পরাইল ধড়া।
গলায় তুলিয়া দিল নব গুঞ্জার ছড়া।।'' [১৪২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালার ছত্রে উল্লিখিত 'ধড়া' বৃন্দাবনে প্রচলিত বালকদের পরিধেয় ল্যাঙ্গোটের মতো ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড। পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রচলিত এই পোষাক বর্তমানে লোকসমাজে প্রচলিত আছে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সপ্তম খণ্ডের অন্তর্গত ''হরিণ কুমার জিরালনী কন্যা''র পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকপোষাক হিসাবে অগ্নিপাটের শাড়ির কথা উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য পালায় জিরালনী কন্যার পোষাক পরিচ্ছদের বিবরণ দিতে গিয়ে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"পিন্ধনে পইরাছে ভালা অগ্নিপাটের শাড়ী।
মাথার কেশবাইন্ধ্যাছে ভালা নিয়া মুক্তা দড়ি।।'' [১৪৩]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পালা রচনার সমসাময়িক কালে অগ্নিপাটের শাড়ীর সুখ্যাতি ছিল। আর সে কারণে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের ''কাঞ্চন কন্যা'' পালায়, 'সদাগর কন্যা বগুলা' পালায় তৃতীয় খণ্ডের 'কমলা কন্যা'র পালায়, 'সনাই সুন্দরী' পালায় চতুর্থ খণ্ডের 'মানিকতারা ডাকাইত' পালায় পঞ্চম খণ্ডের 'কমল সদাইগরে'র পালায় পালা রচয়িতাগণ লোকপোষাক হিসাবে অগ্নিপাটের শাাড়ীর উল্লেখ করেছেন।

এই খণ্ডের 'দেওয়ান ইশা খাঁ' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক পোষাক হিসাবে ইরানের শাড়ীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ইশা খাঁ এর দুই পুত্র আদম ও বিরামের সঙ্গে কেদাররায়ের দুই কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে পোষাক পরিচ্ছদের বিবরণ দিতে গিয়ে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"কইন্যারে পরাইল ইরাণের শাড়ী।
সাজিল দুই বইন আর কত জেয়র পরি।।'' [১৪৪]

এই পালার অন্য একটি ছত্রে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা আদম ও বিরামের বিবাহ উপলক্ষে তাদের যে পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনা দিয়েছেন তা এরকম—

"মিশরের কুর্তা গায় দিল ত তাদের।
চুপি পরাইল আনি আরব দেশের।।''
পারসীর জুতি পরে দিল তারা গায়।
কস্তুরী কুঙ্কুম আতর কত যে ছিটায়।।'' [১৪৫]

এই খণ্ডের অন্তর্গত ''কবি চন্দ্রাবতী দেবী বিরচিত রামায়ণ'' পালায় পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী দেবী শ্রমজীবী

সাধারণ মহিলার লোক পোষাক হিসাবে পাটের শাড়ীর নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, মিথিলা নগরের অধিবাসী মাধব জেলে যে মাছ ধরে, তার পতিব্রতা স্ত্রী সতা সেই মাছ বাড়ি বাড়ি বিক্রয় করে। মাধবের স্ত্রী সতার পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনা দিতে গিয়ে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"ছেঁড়া পাটের শাড়ী সতা গো, কোমরেতে বেড়ি।
মাছের ঝাঁপি মাথায় লয়্যা সতা গো, ফিরে বাড়ী বাড়ী।।"[১৪৬]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে মহিলারা যে পাটের শাড়ী ব্যবহার করতেন এই পালা পাঠ করে আমরা তা জানতে পারি।

এই পালার অন্য একটি ছত্রে দেবী চন্দ্রাবতী লোকপোষাক হিসাবে গঙ্গাজলী শাড়ী এবং পাটের ওড়নার উল্লেখ করেছেন। একদিন মাধব জেলে দেবী মনসার নাম স্মরণ করে জাল ফেললে জালে একটি সোনার কটরা উঠে আসে। এই সোনার কটরা পাওয়ার পর মাধবের দুঃখের দিনের অবসান ঘটে। তার স্ত্রী সতাকে আর বাড়ি বাড়ি মাছ বিক্রয় করতে হয় না। এমতাবস্থায় সতার পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনা দিতে গিয়ে পালা রচয়িতা দেবী চন্দ্রাবতী বলেছেন—

"মাছের ডুলি মাথায় নিয়া গো, সতা না যায় বাড়ী বাড়ী।
রাম লক্ষণ শাঁখা পরে গো, মাধবের নারী।।
গঙ্গাজল শাড়ী পরে গো, পিন্ধনে বাহার।
কোমর বেড়িয়া পরে গো, পাটের পসার।।" [১৪৭]

(চ) লোকখাদ্য

মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে যে তিনটি সামগ্রীর (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান) প্রয়োজন তন্মধ্যে প্রথম এবং প্রধান সামগ্রী হল অন্ন বা খাদ্য। আর সেকারণে সভ্যতাব ঊষা লগ্নে অরণ্যচারী আদিম মানুষ শুধুমাত্র খাবারের সন্ধানে সমস্ত বিপদকে উপেক্ষা করে বন থেকে বনান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। তবে সমাজ পরিবেশের তারতম্য অনুযায়ী মানুষের খাদ্যগ্রহণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের উপর ভিত্তি করে মানুষের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন লক্ষ্য কার যায়। সেকারণে শীত প্রধান অঞ্চলের মানুষ ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষ একই রকম খাদ্য গ্রহণ করে না। এ ছাড়া জাতিগত ঐতিহ্যের কারণে মানুষের খাদ্যাভ্যাস ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এক একটি জাতি বা সম্প্রদায় বাংশানুক্রমে বিশেষ কতকগুলো খাদ্যকে তাদের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত করে রাখে। আর পরিবার কেন্দ্রিক মানুষ শৈশবাবস্থা থেকে যে সমস্ত খাদ্যগ্রহণ করতে শুরু করে, পরিবর্তীকালে সেইভাবে তার খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠে।

শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পালাগুলি থেকে আমরা সমসাময়িক কালের নানাবিধ লোকখাদ্যের সন্ধান পাই। বলা বাহুল্য এই সমস্ত লোকখাদ্যের কোনো কোনাটি আবার বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। তবে গীতিকায় উল্লিখিত অধিকাংশ লোকখাদ্য লোকঐতিহ্যের হাত ধরে আধুনিক লোকসমাজের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবার কোনো কোনো লোকখাদ্য একটু নতুনভাবে পরিবর্তিত নামে বর্তমান লোকসমাজের খাদ্যতালিকায় স্থান লাভ করেছে।

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সাতটি খণ্ডের বিভিন্ন পালায় যে সমস্ত লোকখাদ্যের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

''প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডের প্রথম পালা 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায় পালা রচয়িতা দ্বিজ কানাই লোকখাদ্য হিসাবে হাঁস, কইতর ও টিয়ার মাংস রান্না করে খাওয়ার কথা বলেছেন। আলোচ্য পালার নায়িকা মহুয়াকে বেদের দলের অন্যতম প্রধান সদস্য সুজন বলেছে—

"হাঁস মারবাম্ কইতর মারবাম্
আর বাইচ্ছা মারবাম্ টিয়া।
ভালা কইর‍্যা রাইন্ধ বেনুন
আলো কইন্যা কাইলা জিরা দিয়া।।'' [১৪৮]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে বেদে সম্প্রদায়ের মানুষের লোকখাদ্য বর্তমানে বাঙালি লোকসমাজে বহুলাংশে প্রচলিত। আর ভোজন রসিক বাঙালির কাছে রান্নার একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য হল কালোজিরা।

'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালার অন্য কয়েকটি ছত্রে পালার নায়িকা মহুয়া, পালার নায়ক নদ্যার চাঁদকে উদ্দেশ্য করে বলেছে—

"ঘরে থাকে মইষের দইরে বন্ধু
তুমি খাইবা তিনোবেলা।
সাইল্যা ধানের চিড়া দিবাম্
আর ও দিবাম সব্‌রিকলা।।" [১৪৯]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে মহুয়া নদ্যার চাঁদকে উদ্দেশ্য করে মহিষের দুধ, সালি ধানের চিড়া, সবরি কলা ইত্যাদি যেসব খাদ্য তালিকার কথা বলেছে, তা লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে আজও ভোজন রসিক বাঙালি মাত্রেরই কাছে অত্যন্ত লোভনীয়।

আবার এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা দ্বিজ কানাই পালা রচনার সমসাময়িকালে বেদে সম্প্রদায়ের মানুষদের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে বলেছেন—

"বাইদ্যার খানা শিয়াল, হেজা, ভামের পোড়া মাংস।'' [১৫০]

বেদের দলের এই খাদ্যাভ্যাস, লোক ঐতিহ্যের ধারায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের খাদ্যাভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বেদেরা শিয়াল, হেজা, ভামের পোড়ামাংস খেতে অভ্যস্ত।

এই খাণ্ডের 'সুন্দরী মলুয়া' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে শাইল্যা ধানের চিড়া, শব্‌রি কলা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। পালার নায়ক চাঁদবিনোদ শিকারে যাওয়ার আগে তার বোনের বাড়িতে গেলে তার বোন তাকে যেসব খাদ্যসামগ্রী খেতে দিয়েছে তা এরকম—

"উত্তম শাইল্যের চিড়া গিষ্ঠেতে বান্ধিল।
ঘরে ছিল শব্‌রি কলা তাও সঙ্গে দিল।।'' [১৫১]

এই পালার অন্যত্র অজ্ঞাত রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে মানকচু ভাজা, চালতার অম্বল, রুইমাছের সুরুয়া, কইমাছের চচ্চড়ি ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। এই খাদ্যতালিকা দেখে মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নিদয়ার সাধভক্ষণের খাদ্যতালিকার কথা মনে পড়ে যায়। এছাড়া ও বর্তমান লোকসমাজে এই খাদ্যতালিকা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। পালার নায়িকা মলুয়ার বাড়িতে চাঁদবিনোদ অতিথি হিসাবে উপস্থিত হলে তাকে উপরোক্ত খাদ্য সামগ্রী খেতে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লিখেছেন—

"মানকচু ভাজা আর অম্বল চালিতার।
রুইমাছের সুরুয়া রান্ধে জিরার সম্বার।।
কাইট্যা লইছে কইমাছ চড়বড়ি খারা।
ভালা কইর‍্যা রান্ধে বেনুন দিয়া ক্যাইল্যা জিরা।।"[১৫২]

মলুয়ার পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে চাঁদবিনোদ খেতে বসলে, তাকে এমন সব খাবার খেতে দেওয়া হল, যা চাঁদবিনোদ এর আগে কোনদিন খায়ইনি। এই সময় লোকখাদ্য হিসাবে পালা রচয়িতা যে সমস্ত খাবারের নাম করেছেন ভোজন রসিক বাঙালির কাছে তা অবশ্যই প্রিয়। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে যে পুলি পিঠা, পাতপিঠা, বড়া পিঠা, চিতই, চন্দ্রপুলি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন তা দেখে বাঙালির পৌষপার্বণের পিঠার কথা মনে পড়ে যায়। এই সমস্ত লোক খাদ্য সম্পর্কে পালা রচয়িতা বলেছেন—

'শুকত্ খাইল বেনুন খাইল আর ভাজা বড়া।
পুলি পিঠা খাইল বিনোদ দুধের শির্ষায় ভরা।।
পাত পিঠা বড়া পিঠা চিতই চন্দ্রপলি।
পোয়া চই দিল কত রসে ঢলঢলি।।"[১৫৩]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'আয়না বিবির পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে বিন্নিধানের খই এবং মহিষের দুধ থেকে প্রস্তুত দই এর উল্লেখ করেছেন। আয়নাবিবি তার স্বামী মামুদ উজ্জ্যালকে যেসমস্ত খাবার পরিবেশন করেছে, পালা রচয়িতা সে সম্পর্কে বলেছেন—

"মায়ে তো তুইলা রাখ্ছে বিন্নি ধানের খই।
সুয়ামীরে খাওযায় আয়না ঘরুয়া মইষের দই।।"[১৫৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে যে বিন্নিধানের খই ও মহিষের দুধ থেকে প্রস্তুত দই এর কথা উল্লেখ করেছেন, লোকঐতিহ্যের হাত ধরে তা বর্তমান লোকসমাজে লোকখাদ্য হিসাবে বিশেষ ভাবে প্রচলিত আছে। পূজা পার্বণে আমরা সকলেই খই ব্যবহার করি। এছাড়া আমরা যে লস্যি বা দই খাই তার প্রায় সমস্তটাই মহিষের দুধ থেকে প্রস্তুত করা হয়।

''প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত ''কাঞ্চন কন্যা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক খাদ্য হিসাবে শুকনো মাছ অর্থাৎ শুঁটকি মাছের কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি তমসা গাজি বাণিজ্যে গিয়ে তিন মাস তোরো দিন পর যখন ফিরে এলো তখন নানা দ্রব্য সামগ্রীর সঙ্গে ঝাঁপায় ভরে শুঁটকি মাছ নিয়ে আসে। এই প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা বলেছেন—

" শুকনা মাছ আটির আটি ঝাপায় ভরিয়া।
কত কত দব্য আইনাছে বিদেশ করিয়া।।"[১৫৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে লোক খাদ্য হিসাবে শুঁটকি মাছের প্রচলন ছিল। বর্তমান লোকসমাজে ও এই শুঁটকি মাছ লোকখাদ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

এই খণ্ডের ''রাজকন্যা রূপবতী'' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে ইলিশ মাছ, রুইমাছ, বিন্নিধানের খই, সাইল্যা ধানের চিড়া প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। মুসলমান নবাব রূপবতীকে বিবাহ করতে চাইলে রাজা রাজচন্দ্র জাতিনাশের কারণে বাড়ির চাকর মদনের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে। এরপর গভীর রাতে মদনও রূপবতী বাড়ি, শহর, ত্যাগ করে বহুদূর পালিয়ে যায়। সেখানে গভীর জঙ্গলে নদীর কিনারায়

‘কাঙ্গালিয়া ও জাঙ্গালিয়া নামে জেলেদের গৃহে তারা আশ্রয়লাভ করে। এই জেলেরা রূপবতী ও মদনকে লোকখাদ্য হিসাবে যা খেতে দেওয়ার কথা বলেছে, সে সম্পর্কে পালা রচয়িতা বলেছেন—

“খাইতে দিবাম ইল্‌সা মাছ রুই মাছের মুড়া।
বিন্নিধানের খই দিবাম সাইলা ধানের চিড়া।।’’[১৫৬]

আলোচ্য পালায় জেলেরা ইলিশমাছ, রুইমাছ, বিন্নিধানের খই, সাইলা ধানের চিড়া ইত্যাদি যে লোকখাদ্যের উল্লেখ করেছে সেগুলি বর্তমান লোকজীবন যাত্রায় বাঙালির অতিপ্রিয় খাদ্যতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।

এই খণ্ডের ‘আলাল দুলাল’ এর পালা বা ‘দেওয়ান মদিনা’ পালায় পালা রচয়িতা কবি মনসুর বয়াতি লোকখাদ্য হিসাবে তেলেরপিঠা, খৈ, দই, মাছ, মোরগের মাংস ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। এই পরিচিত খাদ্য তালিকা বাঙালি মাত্রেরই অত্যন্ত প্রিয়। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, বিবাহের পর দুলাল তার স্ত্রী মদিনা বিবিকে তালাক নামা লিখে দিলে মদিনা তা বিশ্বাস করেনা। এদিকে দুলালের প্রতি অগাধ বিশ্বাসে মদিনা প্রতিদিন তার জন্য নানা রকম খাবার প্রস্তুত করে কিন্তু দুলাল আর ফিরে আসেনা। মদিনা দুলালের জন্য যে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করত সে সম্পর্কে পালা রচয়িতা মনসুর বয়াতি বলেছেন—

আইজ বানায় তেলের পিড়া কাইল ভাজে খৈ।
ছিক্কাতে তুলিয়া রাখে গামছা বান্ধা দই।।
ভালা ভালা মাছ আর মোরগের ছালুন।
আইজ আইব বইল্যা রাখে খসমের কারণ।।’’[১৫৭]

আবার ‘‘আমিনা বিবি ও নছর মালুম’’ পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক খাদ্য হিসাবে নাপ্‌ফি অর্থাৎ শুঁটকি মাছ খাবার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই খণ্ডের ‘কাঞ্চন কন্যা’ পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা শুঁটকি মাছের উল্লেখ করেছেন। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলে শুঁটকি মাছ মানুষের অতি প্রিয় লোক খাদ্যের তালিকায় স্থানলাভ করেছে। পালার নায়ক নছর দক্ষিণ মুলুকে অঙ্গী নামক শহরে নানান কারবার খোলে। সেখানকার মহিলারা নাপ্‌ফি বা শুঁটকি মাছকে অন্যতম প্রধান লোকখাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বলেছেন—

“মরদেরা রাঁধে ভাত নারীয়ে হাটে যায়।
ভালা মাছ ছাড়ি তারা নাপফি পচা খায়।।’’[১৫৮]

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে মাছ ভাত ও মহিষের দুধ থেকে প্রস্তুত ছানার উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মাছে ভাতে প্রিয় বাঙালি মাত্রই মিষ্টান্ন হিসাবে দই ও ছানা পছন্দ করে। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, বুধা নামে এক গুণীন ওঝা গিরি করে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। এই বুধা গুণীন লোকখাদ্য হিসাবে যা খায়, সে সম্পর্কে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বলেছেন—

“ওঝাগিরির ব্যবসা ভালা মাছে ভাতে খানা।
দিনে জোটে মহিষের দই রাইতে দুধর ছানা।।’’ ১৫৯

দ্বিতীয় খণ্ডের ‘‘মনির ওঝা ও মঞ্জুর মাও’’ পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে চিড়া, পিঠা, দুধের কাড়িয়া ও নানান ব্যঞ্জনের উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই চিড়া, পিঠা, দুধের কাড়িয়া বাঙালির পৌষপার্বণের খাদ্য তালিকার অন্তর্গত। হাছেন কে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর পর মঞ্জুর মা তাকে যেসব খাদ্যসামগ্রী খেতে দিয়েছিল সে সম্পর্কে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"চিড়া দিল পিঠা দিলরে
আরে ভালা, দুধর কাড়িয়া
নানা ইতি বেনুন দিলরে
আরে ভালা, রান্ধিয়া বাড়িয়া।।"[১৬০]

''প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত ''লীলা কন্যা কবি কঙ্ক'' পালায় পালা রচয়িতাগণ লোকখাদ্য হিসাবে দই ও সাইল্যা ধানের চিড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, লোকখাদ্য হিসাবে দই ও চিড়া বাঙালির অতি প্রিয়। কঙ্কধর মাঠ থেকে সুরভীকে নিয়ে ফিরে এলে লীলা তাকে যেসব খাদ্যসামগ্রী খেতে দিত সে সম্পর্কে পালা রচয়িতাগণ বলেছেন—

"গামছা বান্ধা দৈ রে বন্ধু
সাইল্যা ধানের চিড়া।
তোমারে খাওয়াইবাম্ রে আমি
সামনে থাইক্যা খাড়া।।"[১৬১]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'ভেলুয়া সুন্দরী-আমির সাধু'র পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক খাদ্য হিসাবে খেজুর, কিচ্‌মিচ্, বাদাম, দুধ, ক্ষীর, দুধকমল চাল, ডাবের পানি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। পালারচনার সমসাময়িক কালে লোকসমাজে প্রচলিত এই লোকখাদ্য বর্তমান লোকসমাজেও অতি প্রিয়। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি আমির সাধু বাণিজ্যে যাওয়ার আগের দিন রাত্রে ভেলুয়া সুন্দরী তার জন্য নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করেছে। এ বিষয়ে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বলেছেন—

"খোর্‌মা খাজুর লইল কিচ্‌মিচ্ বাদাম।
কালা গাইয়র দুধ লইল যাত্ হইব কাম
দুধকমল চইল লইল আর লইল চিনি।
ক্ষীর্‌সা রাধিল ভালা দিয়া ডাবর পানি।।"[১৬২]

এই খণ্ডের ''কমলা কন্যা'' পালায় পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান লোকখাদ্য হিসাবে ক্ষীর, সর প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। দুষ্ট চিকন্ গোয়ালিনী মানিক চাক্‌লাদারের বাড়িতে প্রতিদিন দুধ, সর, ক্ষীর প্রভৃতি পৌঁছে দিত। পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান পালার একটি ছত্রে এ সম্পর্কে বলেছেন—

"চাকলাদারের বাড়িতে সেই বৃদ্ধ গোয়ালিনী।
ক্ষীর সর লইয়া নিত্যি করে আনাগুনি।।"[১৬৩]

এই ''কমলা কন্যা'' পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান লোকখাদ্য হিসাবে বাড়িতে পাতা দই, উপ্‌ড়া অর্থাৎ গুড়ের মুড়কি, খই প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই খই, দই, মুড়কি, বর্তমান লোকসমাজে নানা দেবদেবীর পূজায় প্রসাদ হিসাবে নিবেদন করা হয়। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, দৈব দুর্বিপাকে গভীর জঙ্গলে নিরাশ্রয় কমলার সঙ্গে এক বৃদ্ধ মইষালের দেখা হয়। নিঃসন্তান মইষাল কমলাকে তার গৃহে আশ্রয় দেয়। এই কমলা মইষালের বাড়িতে নানা কাজকর্ম করে। সারাদিন মহিষ চরিয়ে মইষাল বাড়ি ফিরলে কমলা তাকে যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী খেতে দিত সে সম্পর্কে পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান পালার ছত্রে বলেছেন—

"গামছা বান্ধা দই কন্যা যতনে পাতিয়া।
উপ্‌ড়া খই দিয়া খাওয়ায় সামনে খাড়া হইয়া।।" [১৬৪]

‘কমলা কন্যা’’ পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান লোকখাদ্য হিসাবে নতুন ধানের চাল থেকে প্রস্তুত চিড়া, পিঠা, পায়েস, খিচুড়ি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান লোকসমাজে নবান্ন উৎসব বা পৌষ পার্বণের সময় বাঙালি মাত্রই এই লোকখাদ্য প্রস্তুত করে। অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষ্মীপূজার সময় পালা রচনার সমসাময়িক কালে মানুষ যে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী দেবীর পূজায় নিবেদন করত সে সম্পর্কে পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান পালার ছত্রে বলেছেন—

“জয়াদি জুকার পড়ে
পরতি ঘরে ঘরে।
নয়া ধানের নয়া অন্নে
চিড়া পিঠা করে।।
পায়েস খিচুরি রাইন্ধ্যা
দেয় দেবের পারণ।’’[১৬৫]

এই খণ্ডের ‘‘শীলা দেবী’’র পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে বিন্নিধানের মুড়ির কথা উল্লেখ করেছেন। বামুন রাজার কন্যা শীলা দেবীর বিবাহ সভায় যে বাজুনীয়ার দল নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে এসেছে তারা পথের খাদ্য হিসাবে বিন্নিধানের মুড়ি নিয়ে এসেছে। লোক খাদ্য হিসাবে এই মুড়ি সকলেরই অতি প্রিয়। পালা রচয়িতা পালার একটি ছত্রে এ সম্পর্কে বলেছেন —

“উত্তর দেশ হইতে একদফা বাজুনীয়া।
জয়ডঙ্কা কাঁধে আইল বিন্নির মুড়ি লইয়া।।’’[১৬৬]

‘‘ প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা’’ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্গত ‘রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই” পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান লোকসমাজে খাদ্য রসিক মাত্রই বর্ষার সময় খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজা পছন্দ করে। রামভাঁড়ালীর কাছে তার আগমনে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় রামভাঁড়ালী রাজচন্দ্রকে বলেছে—

“কাল খাইছি খিচুরি আর দুইডা ইলসা মাছ ভাজা।
পেট কামড়ি উডি আইজ পাই বড়ো সাজা।।’’[১৬৭]

এই পালার অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে রুইমাছের তরকারি, দৈ ও নানাবিধ মিষ্টান্নের কথা উল্লেখ করেছেন। রঙ্গমালা সুন্দরীর লেখা চিঠি রাজচন্দ্রকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রামভাঁড়ালী অগ্রিম পাঁচটাকা বকশিস পায়। এই বকশিস নিয়ে বাজারে গিয়ে রামভাঁড়ালী যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী কিনেছে সে সম্পর্কে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লিখেছেন—

“রোউমাছ তরকারি কিনিল আর কিনিল দৈ।
ভালা ভালা মিডাই কিনিল মনত্ খুশি হই।।’’ ১৬৮

এই খণ্ডের অন্তর্গত ‘মানিকতারা ডাকাইত’ পালায় পালা রচয়িতা কবি সেখ আমিরউদ্দিন লোকখাদ্য হিসাবে বিন্নিধানের খই, বাতাসা ও দৈ এর উল্লেখ করেছেন। মাইন্দা গ্রামের সাধু শীলের কন্যা মানিকতারা বিশুনাপিতের ছেলে বাসুর বাড়িতে এলে বাসুর মা তাকে যে খাদ্য সামগ্রী খেতে দিয়েছিল সে সম্পর্কে মানিকতারা বাসুকে বলেছে—

"ফুলবাতাসা দিয়া খাইলাম
বিন্নিধানের খই।
তোমার মাও যে আইনা দিল
ছিক্কায় তোলা দৈ।।"[১৬৯]

''মানিকতারা ডাকাইত'' পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা সেখ আমির উদ্দিন লোকখাদ্য হিসাবে মুড়ি দিয়ে নারকেল মাখা, গুড়বাতাসা, চিড়ার মোয়া, কাঁঠালের কোয়া, তিলের নাড়ু, নারকেল নাড়ু, পাকাকলা, দই, চিনি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। বিশুনাপিতের পুত্র বাসু নাপিত মাইন্দা গ্রামে সাধুশীলের কন্যা মানিকতারাকে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেলে বাসুকে মানিকতারার বাড়িতে যে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী খেতে দিয়েছে যে সম্পর্কে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লিখেছেন—

"বাসুনাই ছান কইরা আইলে খাইতে দিল জল ।
নুন ত্যাল দিয়া হুড়ুম মাইখ্যা তার সাথে নাইরকল।।
গুড় বাতাসা দিল আইনা আর চিড়ার মোয়া।
পাক্কা ডউয়া ভাইঙ্গা দিল মস্ত মস্ত কোয়া।।''
"তিলের নাড়ু নাইরকল নাড়ু আর পাকা কলা।
একবাটি দই দিল তাতে চিনির দলা।।'' [১৭০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পালা রচনার সমসাময়িক কালে লোকসমাজে প্রচলিত এই লোক খাদ্য বর্তমান লোকসমাজ সাগ্রহে তাদের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। এই খাদ্য সামগ্রী বাঙালীরা বিভিন্ন পূজার সময় তাদের আরাধ্য দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে প্রসাদ হিসাবে নিবেদন করে।

এরপরেও বাসু নাপিতকে মানিকতারার বাড়িতে যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী খেতে দেয় তা খাদ্য রসিক মাত্রেরই কাছে অত্যন্ত লোভনীয়। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে সেই খাদ্যসামগ্রীর উল্লেখ করেছেন—

"মুগের ডাউলে রোউমাছের মুড়া কাঁটা পাইয়া।
ভরা বাটি ঢাইলা লইল ভাত গেলে ওড়াইয়া।।
ঝোল দিল বাটি ভইরা বোয়াল মাছের পেটি।
বিষম ঝাল টকটকে লাল খাইতে কিটিকিটি।।
রোউমাছের আমান পিছা পেটি পঞ্চখান।
ঝোল হুদ্দা বাসু খাইল পেটে পইড়ল টান।।
রোউ মাছের মুড়িঘণ্ট বাসু আর ও খায়।
মুখের নালুচে খাইয়া পাতের ভাত ফুরায়।।
তারপর আইনা দিল কাচা আমলির অম্বল।
বাসু খায়রে চুমুক পাইড়া যেমুন খায়রে জল।।
এক বাটি ঘন দুধ আর এক বাটি দই।
সাপুর সুপুর খাইয়া উইঠল মাখাইয়া খই।।[১৭১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলোচ্য খাদ্যতালিকা বাঙালি মাত্রেরই স্বপ্নের খাদ্যতালিকা। খাদ্যরসিক বাঙালিরা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এই খাদ্য তালিকার কোনো না কোনো খাদ্য অবশ্যই গ্রহণ করে। তবে আলোচ্য

পালায় বাসু নাপিতের আহারের বহর দেখে আমাদের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতুর কথা মনে পড়ে যায়। আর বাসু নাপিতের জন্য প্রস্তুত খাদ্য তালিকা দেখে আমাদের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নিদয়ার সাধভক্ষণের খাদ্য তালিকার কথা মনে পড়ে যায়।

এই খণ্ডের ''নেজাম ডাকাইত পীরের কেরামতি'' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে ছেমাই পিঠা ও ছছি পিঠার কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, সেখ্ ফরিদ, নেজাম কে নিয়ে এক হালুইকরের বাড়িতে রেখে আসে। সেখানে এক বুড়ি বিভিন্ন মিষ্টি পিঠা প্রস্তুত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবান্ন উৎসব বা পৌষ পার্বণের সময় বাঙালির ঘরে ঘরে বিভিন্ন রকম মিষ্টি পিঠা প্রস্তুত করা হয়। বুড়ি যে সমস্ত মিষ্টি পিঠা বানায় যে সম্পর্কে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বলেছেন—

"ছেমাই পিডা বেচে বুড়ি ছছি পিডা কত।
খালা বুলি তারে সবে ডাকে অবিরত।।''[১৭২]

''প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত ''পরীবাণু বেগম'' এর পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে মানুষের মাংসের কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, বাবার দেওয়া সিংহাসনের অধিকার নিয়ে লড়াইয়ে নিজের ভাইয়ের কাছে পরাজিত হয়ে সুজাবাদশা তার আওরাত্ পরীবাণু বেগমকে নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করে। এসময় রাজ্যের নানা জন তাকে নানা স্থানে যেতে নিষেধ করেছে'' এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লিখেছেন—

"না যাইও না যাইও পরী মুরুঙ্গ্যার ঠাঁই
মাইন্সের গোস্ত খায় তারা হিঁজাই হিঁজাই।।''[১৭৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুরুঙ্গ্যা নামে এই পার্বত্য উপজাতি এক হিসাবে রাক্ষস। আর সে কারণে তারা মানুষের মাংসকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

এই খণ্ডের অন্তর্গত ''কবরের কান্না'' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে তরমুজ, ক্ষিরা, বাকি অর্থাৎ ফুটি, মহিষের দই, কুশ্যালের মিডা অর্থাৎ আখের গুড়, দুধ পিঠা, চিংড়ি মাছের তরকারি প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে উক্ত লোকখাদ্য গুলি বর্তমান বাঙালি লোকমাজের খাদ্যতালিকায় স্থান করে নিয়েছে। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, পিতা মাতাকে হারিয়ে নজুমিয়ার পুত্র মালেক নিঃস্ব হয়ে পড়লে নুরুন্নিছার মা তাকে মাতৃস্নেহে দেখাশুনা করত, রান্না করে দিত এমনকি খাওয়ার জন্য নিজের ঘরে ডেকেও আনত। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বলছেন—

"নুরুন্নিছার মাও মালেকর নিত ঘরে ডাকি।
আদর করি খাওয়াই দিত তরমুজ ক্ষিরা বাকি।।
মৈষর দই দিত আর কুশ্যালের মিডা।
দুধর সঙ্গে মিশাই দিত পাক্কনের পিডা।।
\- - - - -
\- - - - -
চিংড়ি মাছের ছালোন আরগিরিম চাউলের বাত।
মোচা বাঁধি নিত মালেক দিয়া কলার পাত।।''[১৭৪]

এই 'কবরের কান্না' পালার অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে হাঁসের ডিম, লৈট্যা মাছের

ঝোল, মাছের ডিমের বড়া, মোরগের মাংস, ছেমাই পিঠা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ঘরবাড়ি সব ভেসে গেলে মালেক ও ভেসে যায়। বহু জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে মালেক পুনরায় দেও গাঁ ফিরে আসে। কিন্তু সেখানে ঘরবাড়ির চিহ্নমাত্র না দেখে নুরন্নেছাকে খুঁজতে খুঁজতে সে রংদিয়ার চরে চলে আসে। সেখানে এসে নুরন্নেছা ও তার পিতা আজগরের সঙ্গে মালেকের সাক্ষাৎ হয়। আজগর মালেক কে বাড়িতে ডেকে আনল। এরপর নুরন্নেছা ও মালেক সামনাসামনি খেতে বসে। এ সময় মালেককে যে খাদ্য খেতে দেওয়া হয়, সে সম্পর্কে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লিখেছেন—

"বেতী চাইলের চিকন্ ভাত ধুমা উড়ি যায়।
নুরন্নেছার মিক্যা মালেক ঠাহরি ঠাহরি চায়।।
পেডত্ ডিম্ব তাজা রিশ্যা গায়ে গায়ে তেল।
গণ্ডা পাঁচেক মালেকের পাতত্ দিয়া গেল্।।
হাঁসের আণ্ডা বাঁধিভালা নুন মরিচ কড়া।
লৈট্যা মাছর ঝোল আর মাছর ডিম্বর বড়া।।
নানান্ ছালোন আর মোরগের গোছ।
খাইয়া দাইয়া মালেকেরমনত্ হইল খোশ।।
নানান্ পদর খানা রাঁধি খানা হইল ভারী।
ছেমাই পিডা খায় মালেক বাসন দিল ছাড়ি।।"[১৭৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খাদ্য রসিক বাঙালির কাছে আলোচ্য লোকখাদ্য অবশ্যই প্রিয় ও লোভনীয়। এই লোকখাদ্য দেখে আমাদের মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নিদয়ার সাধভক্ষণের খাদ্য তালিকার কথা মনে পড়ে যায়।

এই পালার অন্য একটি ছত্রে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে শুকনো মাছের উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, হার্মাদ ডাকাতের দল আজগরের বাড়ি লুঠপাট করে নিয়ে যাওয়ার সময় নুরন্নেছা ও মালেক কে বেঁধে নিয়ে যায়। এরপর এক বালির চরে ডাকাতদের নৌকা আঁটকে গেলে জেলেরা নুরন্নেছা ও মালেক কে উদ্ধার করে। এরপর জেলেরা বড়ো নৌকায় শুকনো মাছ বোঝাই করে মালেক ও নুরন্নে ছাকে নিয়ে রংদিয়ার চরে আজগরের কাছে পৌঁছে দিল। জেলেদের এই শুকনো মাছের নৌকা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় পালা রচনার সমসাময়িক কলে শুকনো মাছের ব্যবসা চলত এবং সমাজে খাদ্য হিসাবে এই মাছের চাহিদা ছিল। অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এ সম্পর্কে বলেছেন—

"বড়ো বড়ো গধুনুকার বড়ো বড়ো পাল।
শুক্না মাছর্ বোঝাই লইল আর যত মালামাল।।"[১৭৬]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৬ষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত 'বাইন্যা বউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে হুড়ুম অর্থাৎ মুড়ি, চিড়া, খই, উপড়া অর্থাৎ মুড়কি, নারকেল নাড়ু, ডালবড়ি, মোরব্বা, আচার প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। স্বামী ছয় মাসের জন্য বাণিজ্যে চলে যাচ্ছে শুনে বাইন্যাবউ স্বামীর জন্য আলোচ্য লোকখাদ্য সাজিয়ে ডিঙায় তুলে দিচ্ছে। বাইন্যা বউ লোকখাদ্য হিসাবে যে সব খাদ্য দ্রব্য তার স্বামীর জন্য পাঠাচ্ছে, সে সম্পর্কে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বলেছেন—

"হুড়ুম, চিড়া, খউ, উপড়া, নাইরকলের নাড়ু।
ডাল বড়ি সজ-মশলা আর চাউল সরু।।

নানান্ রকম কাসুন্দি আর মোরব্বা আচার।
বাইন্যা বউ সাজাইল দব্ব ভারে ভার।।"[১৭৭]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রচলিত এই লোকখাদ্য লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান লোকসমাজে প্রচলিত খাদ্য তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমরা দেব-দেবীর পূজা অর্চনায় খই, মুড়ি, চিড়া, মুড়কি, নারকেল নাড়ু প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে থাকি।

এই পালার অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে ডাল, সুক্তা, রুইমাছ, বোয়াল মাছ ও ইলিশমাছ ভাজা, মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘণ্ট, বেলে মাছের অম্বল, পেটে ডিম ভরা কইমাছের ব্যঞ্জন, ডালের বড়া প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে স্বামী বাণিজ্যে যাবে বলে বাইন্যা বউ স্বামীর মঙ্গল কামনায় মঙ্গল চণ্ডীর পূজা দিয়ে স্বামীর জন্য নানা ব্যঞ্জন রান্নার জন্য রান্না ঘরে প্রবেশ করল। বাইন্যা বউ স্বামীর জন্য যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য রান্না করেছে সে সম্পর্কে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লিখেছেন—

"ডাইল রান্ধিল ডাল্না রান্ধিল শাক সুক্তা যত।
কুমড়ার বেস্‌সরী রান্ধিল ভাজাভুজি কত।।
রউ মাছ রান্ধিল বউ দিয়া পাচ মশলা বাঁটা।
টাট্‌কা ইল্‌সা মাছ রান্ধে কাঞ্চা মরিচ কাটা।।
বোয়াল মাছে আদা বাঁটা ঘন্ট করে ভালা।
নয়া জলের ফুল চাঁইফ্‌লা চচ্চড়ি রসালা।।
মাছের মুড়া মুড়ি ঘন্ট ইলসা গাদা ভাজা।
বাইলা মাছের অম্বল রান্ধন অতি সোজা।।
বড়ো বড়ো কই মাছ পেটে ডিম্ব ভরা।
বেনু্ন রান্ধিল বউ দিয়া ডাইলের বড়া।।"[১৭৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রাচীন পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আলোচ্য লোকখাদ্য তালিকা, লোকঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের লোকখাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই খাদ্য তালিকা ভোজন রসিক বাঙালি মাত্রেরই কাছে গ্রহণযোগ্য ও লোভনীয়।

এই পালার অন্যত্র বাইন্যা বউ এর স্বামী পূজা-অর্চনা শেষ করে জলপান করতে বসলে বাইন্যা বউ তাকে যে সমস্ত জলখাবার খেতে দিয়েছে, সে সম্পর্কে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা তাঁর পালার ছত্রে বলেছেন—

"সাইলা ধানের চিড়া আর গাম্‌ছা বান্ধা দই।
ঘরের গাইয়ের দুধের ক্ষীর বিন্নিধানের খই।।
মস্ত মস্ত শব্‌রিকলা আর কাশীর চিনি।
তালগুড়ের উপ্‌ড্যার সাথে ঘোলের মাঠানি।।
নাইরকল কুড়ায়্যা দিছে হুড়ুমের সাথে।
পাতক্ষীর কইরা দিছে হুড়ুমের পাতে।
বড়ো দুইটা কচি ডাব কাটিয়া ছুলিয়া।
নেওয়া-জল ঢাইলা দিল পাথর বাটিতে ভরিয়া।।"[১৭৯]

প্রাচীন পূর্ববঙ্গের এই খাদ্যতালিকা লোকঐতিহ্যের হাত ধরে আজ ও লোকসমাজে বংশানুক্রমে প্রচলিত

হয়ে চলেছে। আলোচ্য খাদ্যতালিকায় উল্লিখিত চিড়াও দই, ক্ষীরও খই, শব্‌রিকলা, তালের গুড়, নারকেলও মুড়ি, কচি ডাবের জল প্রভৃতি অতি পুষ্টিকর খাদ্য।

ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত 'হাতি খেদার গান' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে জল ছাড়া জমাট বাঁধা দই এর কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, চাউম্মাকুল গ্রামের হাতি ধরার কাজে ওস্তাদ মংলা মঘের বাড়িতে গোলবদন মিঞা এলে, মংলা মঘ তাকে হাতি ধরার কাজে নিযুক্ত হতে বলে। মংলা মঘা গোলবদনকে যা খেতে দেওয়ার কথা বলেছে, সে সম্পর্কে পালা রচয়িতা বলেছেন—

"ঘরত আছে খামা খামা পানি-ছাড়া দই।
খাইয়া দাইয়া দেশে যাইবা হাতি ধরি লই।।" [১৮০]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পালায় লোকখাদ্য হিসাবে ক্ষীর, সর, ননীর উল্লেখ আছে। গোষ্ঠে বিদায় জানানোর সময় মাতা যশোদা রাখাল বালকদের গোপাল বা কৃষ্ণ সম্পর্কে বলেছে—

"দণ্ডে দণ্ডে ক্ষেনে ক্ষেনে খিদা লাগে তার।
ক্ষীর সর ননী বিনে না করে আহার।।"[১৮১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাচীন পূর্ববঙ্গের 'মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পালায় উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের ক্ষীর, সর, ননী খাওয়ার কথা, আমরা বড়ুচণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে শুনতে পাই।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র অন্তর্গত সপ্তম খণ্ডের ''দেওয়ান ঈশা খাঁ" পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকখাদ্য হিসাবে ভেড়ার মাংস দিয়ে প্রস্তুত কাবাব, গোরুরর মাংস দিয়ে প্রস্তুত কোর্মা, কোপ্তা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, মমিনা খাতুন দেওয়ান কালিদাসকে বিবাহ করতে চায়। কিন্তু হিন্দু কালিদাস, মুসলমান মমিনাকে বিবাহ করে নিজের জাতি নষ্ট করতে চায়না। এদিকে মমিনা, কালিদাসকে পাওয়ার জন্য গোপনে তার জাতিনষ্ট করতে যে সমস্ত খাদ্য প্রস্তুত করেছে সে সম্পর্কে পালা রচয়িতা বলেছেন—

''তারপরে ত শুনো কইন্যা কোন কাম করে।
ভেড়ার গোস্ত দিয়া কইন্যা কাবার তৈয়র করে।।
গরুর গোস্ত দিয়া আর ছালুন বানাইয়া
কোর্মা কোপ্তা আরও কত খানা দিল পাঠাইয়া।।"[১৮২]

প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে, আজকের সমাজ ব্যবস্থায় মুসলমানরা গোরুর গোস্ত দিয়ে কাবাব, কোর্মা, কোপ্তা প্রভৃতি খাবার প্রস্তুত করে। পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রাচীন পূর্ববঙ্গে মুসলিম সমাজে প্রচলিত লোকখাদ্য, লোকঐতিহ্যের হাত ধরে আধুনিক মুসলিম সমাজের লোকখাদ্য তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

(ছ) লোকসম্প্রদায়

প্রাচীন কালে মানুষ শিকার জীবনেই অভ্যস্ত ছিল। বিশাল এলাকা জুড়ে বন-জল-জঙ্গল থাকায় প্রাচীনকালে মানুষ যাযাবর জীবনকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তাই কৃষির প্রতি আগ্রহী হতে মানুষের সময় লেগেছিল যথেষ্ট। নদীই মানুষকে একসময় কৃষির প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে, আবার মৎস্যজীবী করার অনুকূল পরিবেশ জুগিয়েছে। পরবর্তীকালে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে নানারকম কাজ করে জীবন ধারণ করতে হয়েছে। আর

এই কাজকর্মের উপর ভিত্তি করে সমাজে নানা বৃত্তির মানুষের আবির্ভাব ঘটল। এরপর বৃত্তিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হল নানা সম্প্রদায়—কামার, কুমোর, চামার, ছুতার, পুরোহিত, গণক, বেদে, ধোপা, মালী, কলু, ডোম, ওঝা, ঘটক, নাপিত, গোয়াল, কাঠুরিয়া প্রভৃতি।

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র অন্তর্গত সাতটি খণ্ডের বিভিন্ন পালায় কোন্ কোন্ লোক সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে নিম্নে সে প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করা হল—

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডের প্রথম পালা 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায় পালা রচয়িতা দ্বিজ কানাই পালার চতুর্থ ছত্রে লোক সম্প্রদায় হিসাবে বেদে সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। বেদে সম্প্রদায় যাযাবর, এরা সারা বছর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। পালা রচয়িতার মতে বেদেরা বর্ষার সময় হিমালয়ের পাদদেশে জৈতা পাহাড়ের বনভূমিতে থাকে। এরা বিভিন্ন রকম বাজী খেলা দেখিয়ে, ডাকাতি করে জীবন ধারণ করে। বর্তমানে বেদে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্তির পথে। পালা রচয়িতা দ্বিজ কানাই পালার শুরুতেই বেদে সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন—

'বনেতে করিত বাস হুমরা বাইদ্যা নাম।
তাহার কথা শুন ভাইরে হিন্দু-মুসলমান।।'[১৮৩]

''বাইদ্যা কন্যা মহুয়া'' পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা দ্বিজ কানাই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষ পূজা অর্চনা করে কায় ক্লেশে জীবন ধারণ করে। পালায় উল্লিখিত নদ্যার ঠাকুর অবশ্য ব্রাহ্মণ জমিদার। বর্তমান লোকসমাজে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় পূজা অর্চনা করে অতি কষ্টে জীবনধারণ করে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। পালার নায়ক ব্রাহ্মণ নদ্যার ঠাকুর, বাইদ্যা কন্যা মহুয়াকে বিবাহ করতে চাইলে মহুয়া তাকে বলেছে—

"তুমি বরাহ্মণ রাজার কুমার
বন্ধু, আমি বাইদ্যার নারী।''[১৮৪]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'আয়না বিবির পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা গারুয়া বা গারো সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায়, গারো সম্প্রদায়ের মানুষ প্রথমে তিব্বত অঞ্চলে বসবাস করত। পরে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে তিব্বত তেকে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। মাতৃতান্ত্রিক গারো সম্প্রদায়ের লোকজন প্রধানত ঝুম চাষ করে জীবন ধারণ করত। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, স্রোতের ঘুর্ণিপাকে উজ্জ্বাল সাধুর নৌকা জলে নিমজ্জিত হলে, সে একটি কাষ্ঠ খণ্ড ধরে ভাসতে ভাসতে গারুয়া বা গারো সম্প্রদায়ের গ্রামের চড়ায় এসে ওঠে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এ সম্পর্কে বলেছেন—

"ভাইস্যা যায়রে উজ্জ্বাল সাধু কাষ্ঠ খণ্ড ধরি।
গারুয়ার গেরামে আইসা চরায় রইল পড়ি।।'' [১৮৫]

'আয়না বিবির পালা'র অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক সম্প্রদায় হিসাবে কুরুঞ্জিয়া সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেছেন। এরা মঘ জাতির একটি শাখা। এরা নৌকায় বাসবাস করে। মাতৃতান্ত্রিক কুরুঞ্জিয়া সম্প্রদায়ের মেয়েরা ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থোপার্জন করে, আর পুরুষরা রান্না বান্না সহ সমস্ত গৃহস্থালির কাজ করে। অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে করুঞ্জিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছেন—

"কুরুঞ্জিয়া এক না জাতি শুন সভাজন।
নায়ে থাকে নায়ে বাসা নায়েতে মরণ।।

পুরুষলোকে রান্ধে বাড়ে নারীয়ে বইস্যা খায়।
ঘরের নারী যত তারা গাঁওয়ালে বেড়ায়।।''[১৮৬]

প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত 'শ্যামরায়ের পালা'য় পালা রচয়িতা নিতাইচাঁদ ডোম সম্প্রদায়ে উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি ডোম সম্প্রদায়ের লোক জঙ্গল থেকে নল কেটে এনে মাছ ধরবার যন্ত্র এবং পাখা তৈরী করে জীবনধারণ করে। বর্তমানে ডোম সম্প্রদায় অস্পৃশ্য হিসাবে পরিগণিত। পালার নায়ক শ্যাম রায় এক ডোম নারীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করে গভীর পার্বত্য অঞ্চলে চলে যায়। পালার ছত্রে পালা রচয়িতা ডোম সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন—

"কাঙ্খে কলসী ডোমের নারী জল আনতে যায়।
রংমওলায় থাইক্যা তাহা দেখে শ্যামরায়।।''[১৮৭]

''শ্যামরায়ের পালা'র অন্যত্র পালা রচয়িতা নিতাই চাঁদ লোক সম্প্রদায় হিসাবে গাবুরিয়া বা গাবর সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। পূর্ববঙ্গের দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলে গাবর সম্প্রদায় বসবাস কর। এদের আচরণ রাক্ষসের মতো। বহু বিবাহে বিশ্বাসী গাবর সম্প্রদায়ের পুরুষদের কমপক্ষে ১০/১৫ জন স্ত্রী ছিল। সুন্দরী নারী পছন্দ হলেই গাবর রাজা তাকে বিয়ে করতে পারতেন। গাবর সম্প্রদায়ের কাছে মেয়েরা ছিল পণ্যসামগ্রী বিশেষ। পালার রচয়িতা পালার ছত্রে গাবরদের সম্পর্কে বলছেন—

"হায় ভালা গাবরিয়া মুলুকের ভাইরে শুন বিবরণ।
সহজে গাবরিয়া জাতি অতি কদাচরণ।।
রাজার পছন্দ যারে সেই পড়ে ফেরে।
দেখিলে সুন্দর নারী আইন্যা বিয়া করে।।''[১৮৮]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পালা 'কাঞ্চন কন্যা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা ধুবা বা ধোপা সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ধোপা সম্প্রদায় সাধারণত অন্যের কাপড়-জামা পরিস্কার করে অর্থোপার্জন করে। বর্তমান লোকসমাজে ধোপা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে। পালা রচনার সমসাময়িক কালে লোকসমাজে ধোপা সম্প্রদায়ের যে অস্তিত্ব ছিল পালা রচয়িতা পালার ছত্রে তার উল্লেখ করেছেন।

"ধুবার কন্যা কাঞ্চনমালা ঘাটে কাপড় কাচে।
রাজার কুমার বাউড়া হইল ধুবার কন্যার পাছে।।''[১৮৯]

'কাঞ্চনকন্যা পালা'র অন্যত্র পালারচয়িতা মালী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। মালী সম্প্রদায়ের প্রধান কাজ পুষ্পচয়ন করা। কাঞ্চন কন্যার বাড়ীতে একজন মালী বাগানে কাজ করত ও পুষ্পচয়ন করত। চরম বিপদে পড়ে কাঞ্চন কন্যার পিতা নিজের ফুলবাগানের মালীর সঙ্গে কাঞ্চন কন্যার বিবাহ দেবেন স্থির করলেন। অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে মালী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন—

"বাগুয়া যে মালী আমার কাম করে বাগে।
রাইত পোযাইলে দিবাম বিয়া সেই বাগুয়ার লগে।।''[১৯০]

এই খণ্ডের 'কমলা রানীর পালা'য় পালা রচয়িতা অধরচাঁদ লোক সম্প্রদায় হিসাবে কোচার অর্থাৎ কোচ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। পালা রচয়িতা অধরচাঁদ পাহাড়ের উপর অবস্থিত মন্দিরে পূজায় পাঁঠাবলি প্রসঙ্গে কোচ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন—

"পাহাড়ের উপরে মন্দির বন জঙ্গলায় ঘিরা
নিত্যি হয় পাঁঠাবলি পূজে কোচারেরা।।"[১৯১]

'কমলা রাণীর পালা'র অন্যত্র পালা রচয়িতা অধরচাঁদ লোক সম্প্রদায় হিসাবে গণক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। গণক সম্প্রদায় হস্তরেখা বিচার করে, বার, তিথি, রাশিফল গণনা করে অন্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে। কমলারানীর জন্মের পর গণক এসে সব কিছু গণনা করে বলে, কমলা রাণীর রাজার ঘরে বিবাহ হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান লোকসমাজে গণক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বর্তমান। তবে লোক সংস্কৃতির বিবর্তনে গণক সম্প্রদায়ের অধুনা জ্যোতিষ সম্প্রদায়ে পরিণতি লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে গণক সম্প্রদায়ে উল্লেখ করেছেন—

''কন্যার জনম্ হইলে গণক আসিয়া।
রাজার ঘরত্ বিয়া হইব কহিল গণিয়া।। ''[১৯২]

এই পালার অন্য দুটি ছত্রে পালা রচয়িতা অধরচাঁদ ঘটক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ঘটক সম্প্রদায় পাত্র-পাত্রী খোঁজ করে তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থোপার্জন করে। পালা রচনার সমসাময়িক কালে ঘটক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমান লোক সমাজে ঘটক সম্প্রদায়, পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। কমলা রাণীর বিবাহ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা ঘটক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন—

"রূপের কথা শুইন্যা কন্যার নানান্ দেশ বিদেশে
বিয়ার সম্বন্ধ লয়্যা ঘটকেরা আইসে।।"[১৯৩]

এই খণ্ডের 'রাজকন্যা রূপবতী' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা জেলে সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। জেলে সম্প্রদায় মাছ ধরে অর্থোপার্জন করে। বর্তমান লোকসমাজে জেলে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে জেলে সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন—

"নদীর পাড়ে আমার বাড়ী জালুয়ার বসতি।
দুশমনের ভয় নাই আমরা ছোটো জাতি।।"[১৯৪]

দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত ''পীর বাতাসী কন্যার পালা'য় পালা রচয়িতা রজনী গোপাল লোক সম্প্রদায় হিসাবে ওঝা সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। কাউকে সাপে কামড়ালে গাছ গাছালি দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ এবং মন্ত্র উচ্চারণ করে ওঝা সম্প্রদায় তাকে সুস্থ করে তোলে। কথিত আছে ওঝা সম্প্রদায় সাপের কামড়ে মৃত ব্যক্তিকে ও বাঁচাতে পারতো। পালা রচনার সমসাময়িক কালে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ওঝা সম্প্রদায়ে বসবাস করত। বর্তমানে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কোনো কোনো স্থানে ওঝা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন—

"ভেউর জঙ্গলা বন কংস নদীর পাড়ে।
সেইখানে সুমাই ওঝা বসতি করে।।" [১৯৫]

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা রজনী গোপাল গাবর সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এরা পাহাড়ীয়া বলবান শ্রমিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডের 'শ্যাম রায়ের পালা'য় পালা রচয়িতা নিতাই চাঁদ এই গাবর সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। পালা রচয়িতা 'পীরবাতাসী কন্যার পালা'র ছত্রে গাবর সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন—

"বন ছাইড়া পত্তরের পথ আছে গাবরের গেরাম্।
হাট বাজার বন্দর আছে হয় নানান কাম।।"[১৯৬]

দ্বিতীয় খণ্ডের 'আমিনা বিবি-নছর মালুম' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা তেলী বা কলু সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তেলী বা কলু সম্প্রদায় তৈল বীজ সংগ্রহ করে ঘানিতে ফেলে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈল নিষ্কাশন করে। পালা রচনার সমসাময়িক কালে পূর্ববঙ্গে তেলী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে তেলী সম্প্রদায় তৈলবীজ থেকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈল সংগ্রহ করে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে তেলী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন—

"বুধা বলে শুনরে বাপ কালুকা ফজরে।
আমার পরিচয়ে যাইবা নজু তেইল্যার ঘরে।।"[১৯৭]

এই পালার অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা মঘ ও পর্তুগীজ জলদস্যু হার্মাদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই হার্মাদ সম্প্রদায় বাণিজ্য জাহাজে ডাকাতি ও লুটতরাজ করত। এমন কি অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করতে গিয়ে বাধা পেলে এই হার্মাদ সম্প্রদায় তাকে হত্যা করতে দ্বিধা করত না। বর্তমানে এই সম্প্রদায় জলদস্যু নামে গভীর সমুদ্রে বাণিজ্য জাহাজ আক্রমন করে ডাকাতি, লুটতরাজ ও হত্যালীলা চালায়। পালারচনার সমসাময়িক কালে হার্মাদ সম্প্রদায়ের অত্যাচারে অনেক বণিক বাণিজ্য যাত্রা করতে ভয় পেত। অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এই নৃশংস হার্মাদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন—

"পর্চিম সাইগরে তখন কি কাম হইত।
হার্মাদ্যা ডাকাইত জাহাজ লুডিয়া লইত।।"[১৯৮]

'আমিনা বিবি-নছর মালুম' পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোক সম্প্রদায় হিসাবে জেলে সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে জেলে সম্প্রদায় পাল তোলা নৌকায় করে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেত। বর্তমানে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে জেলে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। পালা রচয়িতা আলোচ্য পালার ছত্রে জেলে সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন—

"বড়ো বড়ো নুকা লই খাটাইয়া পাল।
সারি গাইয়া যায় জাইল্যা বোসাইতে জাল।।"[১৯৯]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পালা 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় পালা রচয়িতাগণ লোক সম্প্রদায় হিসাবে চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে লোকসমাজে চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন পূর্ববঙ্গে চণ্ডাল সম্প্রদায় শ্মশানে মৃতদেহ সৎকার করে অতিকষ্টে জীবনধারণ করত। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় পূজা-অর্চনা করে দিনাতিপাত করত। তবে পালা রচয়িতাগণ বলেছেন পালা রচনার সমসাময়িক কালে সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ তীব্র ছিল না। পালা রচয়িতাগণ পালার ছত্রে চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে সম্প্রদাগত ঐক্যের কথা বলেছেন—

"ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সব করে কোলাকুলি।
হরিনামে মত্ত তারা সব ভেদ ভুলি।।" [২০০]

'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় পালা রচয়িতাগণ লোকসম্প্রদায় হিসাবে হাড়ি ও ডোম সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। এরা সমাজের অস্পৃশ্য সম্প্রদায়। পালা রচনার সমসাময়িক কালে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ সকলে একসাথে ধর্মকথা শুনতো। তাদের মধ্যে সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ ছিল না। পালা রচয়িতাগণ পালার ছত্রে এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"হাড়ি ডোম চণ্ডাল আর কুলীন ব্রাহ্মণ।
একসঙ্গে বইস্যা করে শ্রবণ কীর্তন।।" [২০১]

তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'কমলা কন্যার পালা'য় পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান গাবর সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডে নিতাই চাঁদ রচিত 'শ্যামরায়' পালায় এই গাবর সম্প্রদায়ে উল্লেখ আছে। পালা রচয়িতার মতে, পূর্ববঙ্গের দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলে গাবর সম্প্রদায় বসবাস করত। নারী বিলাসী গাবর সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা বহুবিবাহ করতেন। এদের আচরণ অত্যন্ত হীন প্রকৃতির। 'কমলা কন্যার পালা'য় পালা রচয়িতা অধর চাঁদ কমলার বাড়িতে যারা কাজ করে তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে গাবর সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন—

"পাঁচখণ্ডী বাড়ী তার বিশ গোটা ঘর।
হাজারে বিজারে খাটে দাঙ্গর আর গাবর।।"[২০২]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'কাফেন চোরা পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক সম্প্রদায় হিসাবে রোসাইঙ্গা, বনজুগী, পাঙ্খোয়া, মুরুং, লেণ্ডাভেণ্ডা কুকী—ইত্যাদি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেছেন। এই সম্প্রদায়গুলো পাহাড়ী বনাঞ্চলে বসবাস করে। এরা বনপথে অপরিচিত কাউকে পেলে তার যথাসর্বস্ব অপহরণ করে। পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রাচীন পর্ববঙ্গে আলোচ্য সম্প্রদায়গুলির অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে সম্প্রদায়গুলোর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন—

"সেখানে বসতি করে রোসাইঙ্গা বনজুগী।
পাঙ্খোয়া মুরুং আর লেণ্ডা ভেণ্ডা কুকী।।"[২০৩]

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকসম্প্রদায় হিসাবে জুমিয়া ও চাক্‌মা সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এরা পাহাড়ী অঞ্চলের পাদদেশে কাঠের পাটাতন করা ছোটো ছোটো ঘরে বসবাস করে। পর্বতের পাদদেশে আবাদ করে শস্য ফলায় এবং বাজারে বিক্রয় করে জীবন ধারণ করে। পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রাচীন পূর্ববঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে এই জুমিয়া ও চাক্‌মা সম্প্রদায়ের মানুষ নানা রকম ফসল ফলাত। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে জুমিয়া ও চাক্‌মা সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন—

"জুম্মা চাম্মোয়া আছে যারা জোম কুচি খায়।
মুড়াক গুড়িত মাচাং বাঁধি সুখ্‌খে দিন কাডায়।।"[২০৪]

'কাফেন চোরা পালা'র অন্যত্র পালা রচয়িতা ওঝা সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ওঝা সম্প্রদায় সাধারণত সাপে কামড়ানো ব্যক্তিকে সুস্থ করে তুলতো। কিন্তু পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন, লুধা গাজী নামে এক ওঝা পাহাড় থেকে বাঁশ, বেত ও ছন্ কেটে এনে বাজারে বিক্রয় করে জীবনধারণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের 'পীরবাতাসী কন্যার পালা'য় পালা রচয়িতা রজনী গোপাল ওঝা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছিলেন। 'কাফেন চোরা পালা'য় ও অজ্ঞাত পালা রচয়িতা ওঝা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন—

"লুধা গাজী নামে ছিল ওঝা একজন।
পাহাড় হইতে আনি বেচে বাঁশ বেত ছন্।।" [২০৫]

তৃতীয় খণ্ডের 'ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী ' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকসম্প্রদায় হিসাবে কোচ এবং হাজং সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। কোচরা জংলী সম্প্রদায়। আর একারণে সিঙ্গি রাজা তার পুত্রের সঙ্গে

কোচ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতীর বিবাহ দিতে নারাজ। সিঙ্গি রাজার কথায় কোচরা নিম্নবৃত্ত সমাজের লোক। আবার অন্যদিকে হাজং সম্প্রদায় কৃষিকাজ করে জীবন ধারণ করে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে কোচ ও হাজং সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন–

"কোচের সঙ্গে কিসের সম্বন্ধ কিসের বিহালী।
আশমান জমিনে কবে হয় যে মিতালী।।
\- - - - - -
\- - - - - -
দূর হওরে ভারইয়া রাণী মোর রাইজ্য ছাড়িয়া।
ঘড়ুইয়া হাজঙ্গের সাথে কন্যারে দেও বিয়া।।'' [২০৬]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'শীলাদেবীর পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক সম্প্রদায় হিসাবে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। মুণ্ডা সম্প্রদায় সাধারণত আাদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি শাখা। এরা অসীম সাহস ও শক্তির অধিকারী। এরা বনের হিংস্রজন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করে বনভূমি কেটে আবাদ বানিয়ে বসবাস করত। পশুশিকার করে ও শস্য ফলিয়ে এরা জীবনধারণ করত। বর্তমানে আদিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায় আর পশুশিকার করে জীবনধারণ করে না। তারা আজ শিক্ষিত হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য করছে, চাকুরি করছে। আলোচ্য পালায় পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এই মুণ্ডা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন -

"জঙ্গলেতে জন্ম মুণ্ডার জাতিত্ জঙ্গলীয়া।
দরবারে খাড়াইল মউণ্ডা সেলাম জানাইয়া।।'' [২০৭]

''প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পালা 'রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকসম্প্রদায় হিসাবে শূদ্র সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। এদেরকে সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণী মনে করা হত না। পালার নায়ক রাজা রাজচন্দর শূদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। আবার নর সম্প্রদায় ছিল সমাজের অস্পৃশ্য শ্রেণী। উচ্চবিত্ত মানুষরা নর সম্প্রদায়ের ছোঁয়া অন্ন জল গ্রহণ করত না। পালার নায়িকা রঙ্গমালা সুন্দরী নর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। পালার ছত্রে রাজচন্দ্র সম্পর্কে রঙ্গমালা সুন্দরী বলেছে–

"তিনি ত শূদ্রের বংশ, আমি নরের ঝি।
আমার ঘরত্ আইলে তানার জাতি রইব নি।।'' [২০৮]

এই পালার অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বামুন বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় পূজা-অর্চনা করে জীবনধারণ করত। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, রঙ্গমালার দীঘি খননের পর দীঘিতে জল তোলার জন্য পূজার প্রয়োজনে মাজদিয়া গ্রামের চন্দর নাথ ব্রাহ্মণকে আনতে পাঠানো হয়। বর্তমান লোকসমাজে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় পূজা অর্চনা ছাড়াও নানারকম কাজ করে থাকেন। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বামুন বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন–

''শুনশুন রাম দাদা কই তোমার ঠাঁই।
জলতোলানী পূজায় একজন ভালা বামুন চাই।।'' [২০৯]

চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্গত 'ভরার মেয়ের গান" পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা ঘটক ও গাবর সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। পালা রচনার সমসাময়িককালে আর্থিক অনটনে যে সমস্ত অভিভাবক কুলীন ঘরে কন্যা বিবাহ দিতে পারত না, তারা ঘটকের নির্দেশমতো কন্যাকে রাতের অন্ধকারে ভরায় বা নৌকায় তুলে দিত।

ঘটক প্রতিশ্রুতি দিত যে, সে কন্যাকে স্বজাতির ঘরে বিবাহ দেবে। ঘটক সম্প্রদায়ে মানুষ পাত্র ও পাত্রী খুঁজে তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করত। বর্তমান লোকসমাজে আজও ঘটক সম্প্রদায়ের মানুষ লোক ঐতিহ্যের হাতধরে একই কাজ করে চলেছে। আর গাবর সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গের দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করত। এরা বহুনারী বিলাসী, অনাচারী, অসভ্য পার্বত্য সম্প্রদায়। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে ঘটক ও গাবর সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন–

''ভরা পাড়া ভরার ঘটক রে
আরে ঘটক ট্যাকা কড়ি খাইয়া।
বৈদেশে গাবরের ঘরে
আমারে দিছে বিয়া।।'' [২১০]

এই খণ্ডের 'মানিক তারা ডাকাইতের পালা'য় পালা রচয়িতা সেখ আমির উদ্দিন লোকসম্প্রদায় হিসাবে মান্দাই সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। পালা রচয়িতার মতে মৈমনসিংহ জেলার উত্তরে গারো পাহাড়ের তরাই অঞ্চলে মান্দাই সম্প্রদায় বসবাস করত। এরা দরিয়ার পাড়ে গোঞ্জের হাটে নৌকায় করে মানুষ ও জিনিসপত্র পারাপার করত। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এই মান্দাই সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন।

"শতে শতে খেওয়া ডিঙ্গি গো
আর জাইল্যা মান্দাইর নাও।
মানুষ লইয়া গাঙ্গ পাড়ি দেয়
ভুইলা বাপ আর মাও।। [২১১]

''মানিকতারা ডাকাইতের পালা'র অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকসম্প্রদায় হিসাবে নাপিত সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। পালায় উল্লেখিত নাই বা নাপিত সম্প্রদায়ের কাজ হল অন্যের চুল-দাড়ি কাটা। বর্তমান লোক সমাজে নাপিত সম্প্রদায় আজও অন্যের চুল দাড়ি কেটে অর্থোপার্জন করে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বিশুনাপিত প্রসঙ্গে নাপিত সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন–

"গোঞ্জের ঘাটে থাইকত বিশু নাই
ঘরে আছিল নাইপতানী।।'' [২১২]

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা সেখ্ আমির উদ্দিন লোক সম্প্রদায় হিসাবে জেলে এবং কোচ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। জেলে সম্প্রদায় মাছ ধরে অর্থোপার্জন করে। কোচ সম্প্রদায় জংলী নিম্নবৃত্ত শ্রেণীর মানুষ। এরা চুরি, ডাকাতি করে দিনাতিপাত করে। অন্যেরা কোচদের অস্পৃশ্য জ্ঞান করে। বর্তমান লোকসমাজে আজ ও জেলে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। পালা রচনার সমসাময়িক কালে জেলে ও কোচ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। পালা রচয়িতা সেখ আমির উদ্দিন পালার ছত্রে বলেছেন–

'বাড়ীর কাছে জাইলা পাড়া আর আছে কোচার।
ইষ্টি কুটুম সরিক সারাত কেটে নাইক্কা তার।।''[২১৩]

চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্গত 'শান্তি কন্যার হাঁহলা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক সম্প্রদায় হিসাবে ওঝা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন । ওঝা সম্প্রদায় সাধারণত ঝাড় ফুক, তুকতাক করে সাপে কাটা ও ভূতে ধরা লোককে বাঁচায়। বর্তমানে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ওঝা সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন এবং সাপে কাটা ও ভূতে ধরা মানুষকে জীবনদান করেন। পালার ছত্রে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা ওঝা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন–

"ওঝা না হই জিওয়ানী না হই,
হারে, আমি হইলাম ঘুনো বাইন্যার ঝি।"[২১৪]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পঞ্চম খণ্ডের প্রথম পালা 'কমল সদাইগরের পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকসম্প্রদায় হিসাবে কাটাইল্যা বা কাঠুরিয়া সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। কাঠুরিয়া সম্প্রদায় বন থেকে কাঠ কেটে তা বাজারে বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করে। বর্তমানে বন থেকে কাঠ কাটা নিষিদ্ধ। আর সেকারণেই কাঠুরিয়া সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিপন্ন প্রায়। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি মইফুলা দাসী, চান্দমনি ও সূর্যমনির আশ্রয়ের জন্য বনমধ্যে একাকিনী ঘুরতে ঘুরতে এক কাঠুরিয়াকে দেখতে পান। এই প্রসঙ্গে পালারচয়িতা কাঠুরিয়া সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন–

"যাইতে যাইতে নারী ছড়া এক পাইল।
এক না কাটাইল্যারে তার কিনারে দেখিল।।"[২১৫]

পঞ্চম খণ্ডের 'পরীবানু বেগম' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক সম্প্রদায় হিসাবে মুরুঙ্গ্যা ও রোসাঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। মুরঙ্গ্যা সম্প্রদায় অত্যন্ত নৃশংস ও অত্যাচারী। এরা চুরি ডাকাতি ও লুঠতরাজ করে জীবনধারণ করে। পার্বত্য পথে কাউকে দেখতে পেলে এরা তার সর্বস্ব অপহরণ করে। এমনকি তাকে হত্যা ও করে। অন্যদিকে রোসাঙ্গ্যা সম্প্রদায় চট্টগ্রামের আরাকানের দক্ষিণে রোসাঙ অঞ্চলে বসবাস করত। এরা কৃষি কাজ এবং দস্যুবৃত্তি করে জীবনধারণ করত। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে আলোচ্য দুই সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন–

"ন যাইও ন যাইও পরী রোসাঙ্গ্যার দেশে।
ধনদৌলত হারাইবা জান যাইব শেষে।।
\- - - - -
\- - - - -
ন যাইও না যাইও পরী মুরঙ্গ্যার ঠাই।
মাইনসের গোস্ত খায় তারা হিঁজাই হিঁজাই।।"[২১৬]

এই পালার অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা হার্মদ্যা বা হার্মাদ নামে দস্যু সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। মঘ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের মিলিত দল হার্মাদ সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এরা অত্যন্ত নৃশংস সম্প্রদায়। যারা গভীর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দূরদেশে বাণিজ্য করতে যায় হার্মাদ সম্প্রদায় অতর্কিত আক্রমন করে তাদের সর্বস্বলুঠ করে। এই কার্যে তাদের কে কেউ বাধা দিতে এলে হার্মাদরা নির্দ্বিধায় তাদেরকে হত্যা করত। আজ ও গভীর সমুদ্রে হার্মাদ জলদস্যু সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের খবর শোনা যায়। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এই হার্মাদ্যা বা হার্মাদ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন–

"হার্মাদ্যারা লয়্যা যাইব গলাও বাঁধি দড়িরে
সাইগরে ভুপাইলি পরী রে।।" [২১৭]

পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত 'ছুরত জামাল - অধুয়া সুন্দরী' পালায় পালা রচয়িতা ফৈজু ফকির লোকসম্প্রদায় হিসাবে গণক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে পূর্ববঙ্গে গণক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। গণক সম্প্রদায় ভবিষ্যৎ গণনা করে কোনো ব্যক্তির বিপদ বা দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। বর্তমানে গণক সম্প্রদায় ভিন্ন নামে জ্যোতিষী সম্প্রদায় হিসাবে আজও লোকঐতিহ্যর হাত ধরে ভবিষ্যৎ গণনার কাজ করে চলেছে। পালার নায়ক ছুরত জামালের জন্মের পূর্বে তার ভবিষ্যৎ গণনা প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা ফৈজু

ফকির গণক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন–

"গণকে আনিয়া দেওয়ান গাণা গণাইল।
শুনিয়া বাছিয়া গণক ছাহেবরে জানাইল।।" [২১৮]

পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত 'কবরের কান্না' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা জেলে ও রোসাঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। জেলে সম্প্রদায় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত এবং রোসাঙ্গ্যা সম্প্রদায় প্রথম দিকে চুরি ডাকাতি করত, তবে পরবর্তী কালে এরা কৃষিনির্ভর হয়ে ওঠে। পালারচনার সমসাময়িক কালে এই জেলে ও রোসাঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমান লোকসমাজে জেলে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকলেও রোসাঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অবলুপ্তির পথে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে জেলে ও রোসাঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন–

"ওরে কত জাইল্যা ঘর বাঁধিল
নয়া রংদিয়ার চরে।
রোসাঙ্গ্যা ক্ষেত্যাল আসি
তারা বলা জমিন ধরে।।" [২১৯]

'কবরের কান্না' পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোক সম্প্রদায় হিসাবে জেলে, জোলা, ধোপা, নাপিত, কামার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। জেলে সম্প্রদায় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। জোলা সম্প্রদায় তাঁতবস্ত্র তৈরী করে জীবনধারণ করে। ধোপা সম্প্রদায় পোষাক পরিচ্ছদ কেচে জীবিকা নির্বাহ করে। নাপিত সম্প্রদায় ক্ষৌরকর্ম করে এবং কামার সম্প্রদায় নিত্য ব্যবহার্য লোহার যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে আলোচ্য লোক সম্প্রদায়গুলির যেমন অস্তিত্ব ছিল, লোকঐতিহ্যের হাত ধরে আজও লোকসমাজে এই লোকসম্প্রদায়গুলির অস্তিত্ব সমানভাবে টিকে আছে। পালা রচয়িতা পালায় প্রবল ঝড়ে যখন সবকিছু ওলোটপালোট হয়ে গেছে তখন বিভিন্ন লোকসম্প্রদায়ের কি কি ক্ষতি হয়েছে যে সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন–

"জাইলার জাল গেল জোলার তাঁত গেল
ধোবার গেল তক্তা।
নাপিতের হুঁজ গেল কামারের বাতি।" [২২০]

এই একই পালার অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক সম্প্রদায় হিসাবে হার্মদ্যা বা হার্মাদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। মঘ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের মিলিতি নাম হার্মাদ। হার্মাদ সম্প্রদায় গভীর সমুদ্রে অতর্কিতে বাণিজ্য জাহাজ আক্রমন করে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় খণ্ডের 'আমিনা বিবি-নছর মালুম পালা'য়, পঞ্চম খণ্ডের 'পরীবানু বেগমের পালা'য় ও 'কবরের কান্না পালা'য়, এই হার্মাদ দস্যু সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। এ থেকে অনুমান করা যায় পালা রচনার সমসাময়িক কালে হার্মাদ্ জলদস্যুদের উপদ্রব চরমে পৌঁছে ছিল। অধুনা গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের উপর হার্মাদ দস্যুদের অত্যাচারের কথা শোনা যায়। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে হার্মাদ দস্যুদের সম্পর্কে বলেছেন–

"সেই না সাইগরের মাঝে হার্মাদ্যার দল।
বাকে বাকে ঘুরে সদাই বড়ো বিয়াক্কল।।" [২২১]

''পঞ্চম খণ্ডের 'বারোতীর্থের গান' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি তীর্থভ্রমণ করে রাজা ভগদত্ত বাড়ী ফিরে পুণ্যার্জনের জন্য ব্রাহ্মণদের অন্ন

সেবা দিল ও বস্ত্রদান করল। পালা রচনার সমসাময়িক কালে ব্রাহ্মণদের সকলে শ্রদ্ধা ভক্তি করত। তাদের কে অন্নদান বা বস্ত্রদান করলে পুণ্য হবে—একথা সকলে বিশ্বাস ও করত। বর্তমানে ব্রাহ্মণ সম্পর্কে মানুষের চেতনার কোনো পরিবর্তন হয় নি। আজও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে সকলে শ্রদ্ধাভক্তি করে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছেন—

"বাওনরা কত খাইল লইল
কত বস্ত্র কড়ি দান পাইল।'' [২২২]

' প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত ' ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা নাপিত সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেছেন। লোকঐতিহ্যের ধারায় নাপিত সম্প্রদায় চুল -দাড়ি কামিয়ে অর্থোপার্জন করে। বর্তমান লোক সমাজে নাপিত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বর্তমান। পালা রচনার সমসাময়িক কালে নাপ্ত্যানীরা ও চুলকাটত, গোঁফ-দাড়ি কামাত। বর্তমান লোকসমাজে নাপ্ত্যানীদের চুলকাটা বা দাড়ি-গোঁফ কামাতে দেখা যায় না বললেই চলে। আলোচ্য পালায় পালা রচয়িতা দেখিয়েছেন কৌশল্যা নামে নাপ্ত্যানী মদন সাধুর বাড়িতে গোঁফদাড়ি কামাতে গেছে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন —

"কৌশল্যা নাপ্ত্যানী ছিল রাংচা পুরে বাড়ি।
একদিন কামাইতে গেল মদন সাধুর পুরী।।'' [২২৩]

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোক সম্প্রদায় হিসাবে ডোম সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে ডোম সম্প্রদায় খারি অর্থাৎ ফুলতুলবার সাজি বিউনি অর্থাৎ পাখা ইত্যাদি বানিয়ে অর্থোপার্জন করত। বর্তমান লোক সমাজে ডোম সম্প্রদায়কে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষ জন অস্পৃশ্য জ্ঞান করে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ডোম সম্প্রদায়, মৃতদেহ সৎকার বা নানা রকম নোংরা আবর্জনা পরিস্কারের কাজ করে থাকে। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি ডুমুনীর ছদ্মবেশে সলুকা সুন্দরী খারি ও বিউনি বিক্রিয়ের অছিলায় আবু রাজার অন্দরমহলে প্রবেশ করে ভেলুয়া সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করে। পালা রচনার সমসাময়িক কালে ডোম সম্প্রদায়ের যে অস্তিত্ব ছিল পালা রচয়িতা আলোচ্য পালার ছত্রে তার উল্লেখ করেছেন—

"ডুমূনীর বেশ ধইর‍্যা সলুকা সোন্দবী।
খারি বিউনি লয়্যা যায় আবু রাজার পুরী।।'' [২২৪]

ষষ্ঠ খণ্ডের ''হাতি খেদার গান'' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক সম্প্রদায় হিসাবে কুকী ও মুরুং সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেছেন চট্টগ্রামের পূর্বে যে পাহাড় আছে সেখানে কুকী ও মুরুং সম্প্রদায় বসবাস করে। এরা পার্বত্য অরণ্য থেকে বাঁশ, বেত ও ছন্ সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে। বর্তমানে কুকী ও মুরুং সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে কুকী ও মুরুং সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন—

"এরে, আছমান্ - লাগা মুড়া আছে চাড়ীগাঁয়র পূগে।
কুকী, মুরুং পাহাইড়া লোগ সেহানে দিন কাডায় সুগে।।'' [২২৫]

''হাতি খেদার গান' পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা জুম্মা অর্থাৎ জুমিয়া এবং চাউম্মা অর্থাৎ চাক্মা সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। পালা রচনার সমসাময়িক কালে জুমিয়া ও চাক্মা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। এই দুই সম্প্রদায় পাহাড়ের পাদদেশে আবাদ করে শস্য ফলাত এবং বাজারে বিক্রয় করে জীবনধারণ করত। এছাড়া 'বেত, বাঁশ ও ছন্ কেটে বাজারে বিক্রয় করে ও এরা জীবনধারণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'প্রাচীন পূর্ব বঙ্গ

গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের 'কাফেন চোরা পালা'য় জুমিয়া ও চাকমা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এই দুই সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেছেন–

"এই মতন কাঁদে চাষা হাতির পৈমালে।
পাহাইড়া জুম্মা চাউম্মা পড়িল বেনালে।।"[২২৬]

এই পালার অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক সম্প্রদায় হিসাবে ভিন্‌ছা বা আরাকানের মঘ দস্যু সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। এরা দস্যুতা বৃত্তি অবলম্বন করে জীবন ধারন করত। বর্তমান লোকসমাজে ভিন্‌ছা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। পালা রচনার সমসাময়িক কালে রোসাঙ্গ দেশে ভিন্‌ছা সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছেন্–

"এ হার দহিনে আছে রোসাঙ্গ্যার দেশ।
ভিনছায় লাগত্ পালি ছুরি মারি করিদিব শেষ।।"[২২৭]

এই 'হাতি খেদার গান' পালার একটি ছত্রে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা, গভীর জঙ্গলে হাতি অন্বেষণের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে লোক সম্প্রদায় হিসাবে জেলে সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। জেলে সম্প্রদায় সাধারণত মাছ ধরে তা বাজারে বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করে। বর্তমান লোক সমাজে জেলে সম্প্রদায় আজও লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে মাছ ধরে জীবন ধারণ করে চলেছে। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি জেলে সম্প্রদায় যেমন ঘোলায় জাল পেতে মাছ ধরবার চেষ্টা করে তেমনি হাতি খেদায় লোক গভীর জঙ্গলে হাতি অন্বেষণ করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে জেলে সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন–

'' অঘোর জঙ্গলাত্ তারা তোয়াইছে হাতি।
জাইলা যেমুন জাক্ ঘোলায় খালত জাল পাতি।।"[২২৮]

ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত ' মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' পালায় পালা রচয়িতা মহিলা কবি সুলা লোক সম্প্রদায় হিসাবে গোয়ালিনী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। গোয়ালা/গোয়ালিনী সম্প্রদায় দধি দগ্ধ বিক্রয় করে জীবনধারণ করে। বর্তমান লোক সমাজে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পরলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গোয়ালা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। পালা রচয়িতা মহিলা কবি সুলা তাঁর পালার ছত্রে গোয়ালা/গোয়ালিনী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন–

"যার নামে শমন পলায় দুঃখ যায় দূরে।
সে পুত্র পলায় আজি গোয়ালিনীর ডরে।।"[২২৯]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সপ্তম খণ্ডের অন্তর্গত 'হরিণ কুমার জিরালনী কন্যার পালা'য় পালা রচয়িতা লোকসম্প্রদায় হিসাবে মঘ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এরা দস্যুবৃত্তি করে জীবনধারণ করে। পালা রচনার সমসাময়িক কালে মঘ দস্যুদের অত্যাচার চরমে পৌঁছেছিল। পালার ছত্রে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা মঘ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন–

"ভাটি মুল্লুকরে ভাই, মঘুয়া ডাকাইতের দেশে।
সেই মঘুয়ার আইসে জ্বল ভোলার তড়াশে।।"[২৩০]

সপ্তম খণ্ডের অন্তর্গত 'সন্নমালার পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক সম্প্রদায় হিসাবে ওঝা সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেছেন। ওঝা সম্প্রদায় সাধারণত সাপে কামড়ানো মানুষকে এবং ভূতে পাওয়া মানুষকে ঝাড়, ফুক্ তুক্তাক্ করে বাঁচিয়ে তোলে। বর্তমান লোক সমাজে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ওঝা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত

হয়। পালা রচনার সমসাময়িক কালে পূর্ববঙ্গে ওঝা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। আলোচ্য পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বলেছেন–

''কোথায় পাইব মণি? কেউ না জানি না শুনি।
ডাইক্যা আন রাইজ্যের যত ওঝা বদ্যি গুণী।।''[২৩১]

এই পালার অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা জেলে সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। জেলে সম্প্রদায় মাছ ধরে বাজারে বিক্রয় করে জীবন ধারণ করে। পালা রচনার সমসাময়িক কালে জেলে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমান লোকসমাজে জেলে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"এরে দেইখ্যা জালুয়া না
আরে কি কাম করিল।
পাড়ায় বান্দা আছিল নাও
নায়ের বন্ধন খুইলা দিল।।''[২৩২]

'সন্নমালার পালা'র অন্যত্র পালা রচয়িতা লোক সম্প্রদায় হিসাবে কাঠুরিয়া সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেছেন। কাঠুরিয়ারা বন থেকে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করে। পালা রচনার সমসাময়িক কালে পূর্ববঙ্গের অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলে কাঠুরিয়া সম্প্রদায় কাঠ কেটে জীবনধারণ করত। আলোচ্য পালায় জেলে সম্প্রদায় কাঠুরিয়া সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করছে–

কাঠ কাটো কাঠুইর‍্যা ভাই, এডা কোন রাজার দেশ?
আমাগো রাড়ী মন্নমালার দেশ।''[২৩৩]

সপ্তম খণ্ডের অন্তর্গত রাজা রঘুর পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক সম্প্রদায় হিসাবে গাড়ো সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন। এরা গারো পাহাড় অঞ্চলে বসবাস করে। গাড়োদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। গাড়ো সম্প্রদায় কৃষি কাজ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ইছাই খাঁ সুযুঙ্গের বালক রাজা রঘুনাথকে ধরে আঁটকে রাখলে সুযুঙ্গের সমস্ত গাড়ো সমপ্রদায়ের মানুষ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জঙ্গলবাড়ী আক্রমন করে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে গাড়ো সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন–

"থরমর লাইগ্যা গেল সুযং মুল্লুক জুইড়্যা।
গাড়ুলীর যত গাড়ো আইল সগল লাইম্যা।।''[২৩৪]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ' পালায় পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী লোক সম্প্রদায় হিসাবে গণক সম্প্রদায়ে নাম উল্লেখ করেছেন। গণক সম্প্রদায় কারুর জন্মের তারিখ তিথি গণনা করে এবং হস্তরেখা বিচার করে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবগত করে। বর্তমানে গণক সম্প্রদায়, জ্যোতিষি সম্প্রদায় নামে মানুষের ভবিষ্যৎ গণনা করে উপার্জিত অর্থে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, রাণী মন্দোদরী একটি ডিম প্রসব করলে রাজা বারণ সেই ডিমের ভবিষ্যৎ গণনার জন্য গণক আনতে পাঠিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"এহি কথা রাবন রাজাগো, যখনে শুনিল।
গণক আনিতে রাজা গো, চর পাঠাইল।।''[২৩৫]

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকসম্প্রদায় হিসাবে জেলে সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। জেলে সম্প্রদায় মাছ ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। পালা রচনার সমসাময়িক কালে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে

জেলে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের 'রাজকন্যা রূপবতী' পালায়ও 'আমিনা বিবি ও নছর মালুম' পালায়, পঞ্চম খণ্ডের 'কবরের কান্না' পালায়, ষষ্ঠ খণ্ডের 'হাতি খেদার গান' পালায়, সপ্তম খণ্ডের 'সন্নমালার পালা'য়, লোক সম্প্রদায় হিসাবে জেলে সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। 'কবি চন্দ্রাবতীদেবী বিরচিত রামায়ণ' পালায় পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী বলেছেন—

"মিথিলা নগরে আাছিল গো দুঃখী মাধব জালিয়া।
জাল বায় মাছ ধরে গো ঘাটে দেয় খেওয়া।।"[২৩৬]

(জ) লোকবাদ্য

আনন্দ বিনোদনের জন্য সঙ্গীত, নাট্য, নৃত্য প্রভৃতি উৎসব কেন্দ্রিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অঞ্চল ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্রকে লোকবাদ্য বলে। লোকসঙ্গীত, লোকনাট্য এবং লোকনৃত্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লোকবাদ্য হিসাবে ঢাক ঢোল, করতাল, মাদল, বাঁশি, একতারা, দোতারা, সেতারা, হারমোনিয়াম প্রভৃতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এককালে যুদ্ধ বাদ্য হিসাবে ঢাক ঢোল বাজানো হত। এছাড়া পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়—সর্বপ্রকার শুভ অনুষ্ঠানে ঢাকের বাদ্যি শোনা যেত। তাছাড়া বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজের মধ্যে উদ্দামতা থাকে, যে তাল থাকে তা থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর নাচের প্রকরণ ও সৃষ্টি হয়েছে। তাই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলির মতো লোকবাদ্যের গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

এবার আমরা পর্যালোচনা করে দেখবো, ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত ' প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সাতটি খণ্ডের বিভিন্ন পালায় কোন প্রসঙ্গে কী কী লোক বাদ্যের কথা উল্লেখিত হয়েছে—

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডের প্রথম পালা 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায় পালা রচয়িতা দ্বিজ কানাই লোকবাদ্য হিসাবে 'ডুল' অর্থাৎ ঢোল এবং করতালের উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে হুমরা বেদে তার দলবল নিয়ে বামন কান্দা গ্রামে নদ্যার চাঁদের বাড়িতে খেলা দেখাতে এসেছে। ঢোলে বাড়ি মেরে হুমরা বেদে খেলা শুরু করলে সমস্ত গ্রামবাসী খেলা দেখার জন্য ছুটে এল। বেদের দলে খেলার সঙ্গে গান বাজনারও ব্যবস্থা ছিল। খেলার শেষে পালার নায়িকা মহুয়াকে করতাল বাজিয়ে গান গাইতে দেখা গেল। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা দ্বিজ কানাই পালার ছত্রে বলেছেন—

"কলতালের ঝুনুঝুনু ডুলে মাইলো বাড়ি।
গাহান গাইতে আইলাম আমরা নদ্যা ঠাকুরের বাড়ি।।"[২৩৭]

বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে লোকবাদ্য হিসাবে ঢোলের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া আধুনিক সংস্কৃতিতে যাদুকররা লৌকিক -অলৌকিক খেলা প্রদর্শনের সময় ও গান-বাজনার ব্যবস্থা রাখেন।

'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাবে বাঁশির কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, পালার নায়িকা মহুয়ার খেলা প্রদর্শনের কৌশল দেখে এবং তার রূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পালার নায়ক নদ্যার চাঁদ মনের অজান্তেই তাকে ভালোবেসে ফেলে। অন্যদিকে মহুয়া ও নদ্যার চাঁদের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। এরপর দুজন দুজনের প্রেমে এমনি আত্মহারা হয়ে পড়ে যে, রাত্রি দ্বিপ্রহর বেলায় নদ্যার চাঁদ নদীর ঘাটে বাঁশি বাজালে মহুয়া উন্মত্ত হয়ে সেখানে চলে আসে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন—

"ঘাটে বইস্যা বাজায় বাঁশি
সেই না নিশি রাইতে।
ঠার দিয়া বাজাইল বাঁশি
পিয়া মহুয়ারে আনিতে।।"[২৩৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আদিমধ্য যুগের একমাত্র নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে নায়ক শ্রীকৃষ্ণ নায়িকা শ্রীরাধিকার উদ্দেশ্যে গভীর অরণ্যে বাঁশি বাজাতেন। অন্যদিকে শ্রীরাধিকাও বাঁশির শব্দে মোহিত হয়ে কৃষ্ণের সান্নিধ্যে চলে আসতেন। নদ্যার চাঁদ ও মহুয়ার প্রেম আমাদেরকে রাধা কৃষ্ণের প্রেমের কথা মনে করিয়ে দেয়। নদ্যার চাঁদের বংশী ধ্বনির মধ্যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনির আবেশ উপলব্ধি করি। লোক ঐতিহ্যের ধারাপথে আদি মধ্য যুগের শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনি অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালার নায়ক নদ্যার চাঁদকে অবলম্বন করে আধুনিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এসে পৌঁছেছে। বর্তমানে বিভিন্ন সঙ্গীতে বিশেষত লোকসঙ্গীত বা ধ্রুপদী সঙ্গীতে লোকবাদ্য হিসাবে বাঁশীর ব্যবহার অপরিহার্য। এছাড়া যাত্রা, নাটকেও যন্ত্রসঙ্গীত হিসাবে অবশ্যই বাঁশীর ব্যবহার বর্তমানে করা হয়।

এই খণ্ডের 'সুন্দরী মলুয়া' পালায় পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী লোকবাদ্য হিসাবে ঢোল ও ডগর-এর কথা উল্লেখ করেছেন। মাঘ মাসে শুভদিনে চাঁদ বিনোদ ঘোড়ায় চেপে ঢোল, ডগর ইত্যাদি লোকবাদ্য সহকারে মলুয়া কে বিবাহ করতে চলল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান লোকসমাজে বিবাহের সময়, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষত প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় লোক বাদ্য হিসাবে ঢাক, ঢোল ডগর ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। চাঁদ বিনোদের বিবাহ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লোকবাদ্যের উল্লেখ করেছেন–

"আগে পাছে বাদ্য বাজে ঢোল ডগর।
বরযাত্রী হইল যত পাড়ার নাগর।।"[২৩৯]

'সুন্দরী মলুয়া' পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী লোকবাদ্য হিসাবে ঢাক ঢোল-এর কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে পালার নায়ক চাঁদবিনোদ উপার্জনের জন্য পৌষমাসে বিদেশ যাত্রা করে। এদিকে স্বামীর চিন্তায় মগ্ন মলুয়া তার জন্য প্রহর গুনতে থাকে। দীর্ঘ ছয় মাস অতিবাহিত করার পর বিরহাতুর মলুয়া শ্রাবণ মাসে স্বামীর মঙ্গল কামনায় মনসাদেবীর কাছে মানত করে। এ প্রসঙ্গে পালার রচয়িতা পালার ছত্রে মনসার মন্দিরে ঢাক-ঢোল বাজার কথা উল্লেখ করেছেন–

"ঢাক ঢুল বাজে কত মনসার মন্দিরে।
দেবতার পায় মলুয়া মনে মানত করে।।"[২৪০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান লোকসমাজে শুধুমাত্র মনসাদেবী নয়, আরো বিভিন্ন লৌকিক দেবতার মন্দিরে লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে আজ ও ঢাক, ঢোল করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজতে শোনা যায়। বিভিন্ন পূজা বা ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও বিবাহ উৎসবে ও আধুনিক গানের সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ঢোলের ব্যবহার করা হয়।

এই খণ্ডের 'চন্দ্রাবতী' পালায় পালা রচয়িতা নয়ান চাঁদ ঘোষ লোক বাদ্য হিসাবে ঢোল, ডগর ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। ''চন্দ্রাবতী' পালার নায়ক জয়ানন্দ নায়িকা চন্দ্রাবতীর বিবাহ উপলক্ষে পালা রচয়িতা আলোচ্য বাদ্যযন্ত্রের কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বর্তমান লোকসমাজে আজ ও বিবাহ উপলক্ষে ঢাক, ঢোল ডগর ইত্যাদি লোকবাদ্য ব্যবহৃত হয়। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লোকবাদ্য প্রসঙ্গে বলেছেন–

''ঢুল বাজে ডগর বাজে জয়াদি জুকার।
মালা গাস্থে কুলের নারী কত মঙ্গল আচার।।"[২৪১]

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'কেনা ডাকাতের পালা'য় পালা রচয়িতা কবি চন্দ্রাবতী লোকবাদ্য হিসাবে খোল, করতাল, একতারা ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে, চন্দ্রাবতীর পিতা দ্বিজ বংশীদাস শিষ্যগণ পরিব্যাপ্ত হয়ে লোকবাদ্য সহকারে হরিনাম সংকীর্তনে মগ্ন হন। এই হরিনাম সংকীর্তনে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে খোল, করতাল, একতারা ইত্যাদির ব্যবহারের কথা পালা রচয়িতা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান লোকসমাজে লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে আজ ও হরিনাম সংকীর্তনের সময় খোল, করতাল, একতারা ইত্যাদি লোকবাদ্য বাজানো হয়। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে দ্বিজ বংশীদাসের হরিনাম সংকীর্তন উপলক্ষে লোকবাদ্যের উল্লেখ করেছেন–

"খোল বাজে করতাল বাজে বাজে একতারা।
পিতার সহিতে গায় শিষ্য সঙ্গে যারা"[২৪২]

'কেনা ডাকাতের পালা'র অন্যত্র পালা রচয়িতা কবি চন্দ্রাবতী লোকবাদ্য হিসাবে মৃদঙ্গের নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি দ্বিজবংশী দাসের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে দোর্দণ্ডপ্রতাপ দস্যু কেনারাম দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে। অনুশোচনা দগ্ধ কেনারাম পাপমুক্তির জন্য দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে গান করতে করতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুক্তি ভিক্ষা করে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা দস্যু কেনারামের মৃদঙ্গ বাজানোর কথা উল্লেখ করেছেন –

"আকাশ ছাপায়্যা গান যায় স্বর্গপুরে।
মৃদঙ্গ বাজায়্যা কেনা বাড়ী বাড়ী ঘুরে।।"[২৪৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান লোকসমাজে বিভিন্ন সমাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকবাদ্য হিসাবে আজ ও মৃদঙ্গের ব্যবহার লক্ষিত হয়।

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'শ্যাম রায়ের পালা'য় পালা রচয়িতা কবি নিতাই চাঁদ লোকবাদ্য হিসাবে মহিষের চামড়া দিয়ে নির্মিত ঢাক এবং মহিষের শিং দিয়ে নির্মিত শিঙ্গার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি রাজা শ্যাম রায় ডোমকন্যার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করে। এরপর শ্যাম রায় ও ডোম কন্যা গাবররাজ্যে গিয়ে পৌঁছলে গাবর রাজা ডোমকন্যার রূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহ করতে চাইল। সিদ্ধান্ত হয় যে, ডোম কন্যা যদি গাবর রাজাকে বিবাহ করতে রাজী না হয় তবে শ্যামরায়কে শূলে চড়ানো হবে। নিরুপায় ডোম কন্যা গাবর রাজাকে বিবাহ করতে রাজী হয়ে শ্যাম রায়ের জীবন রক্ষা করল। গাবর রাজবাড়িতে বিবাহ উপলক্ষে নাচ-গান-বাজনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লোকবাদ্য হিসাবে ঢাক ও শিঙ্গার কথা বলেছেন–

"আইল বিয়ার দিন বাজিল বাজন।
নারী পুরুষ মিইল্যা হইল গাবরের নাচন।।
মইষের চামড়া দিয়া বানাইছে ঢাক।
নারীগুলা নাচে যেমন কুমারের চাক।।
মইষের শিং দিয়া বাজাইছে শিঙ্গা।।"[২৪৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান লোকসমাজে আজও ঢাক ও শিঙ্গা বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। নদী মাতৃক বঙ্গদেশে খেয়াপারাপার করার সময় মাঝিরা শিঙ্গা বাজিয়ে নৌকা যাত্রীরদের আহ্বান করে। এছাড়া এককালে ঢাক ও শিঙ্গা বাজিয়ে রাজা-মহারাজারা যুদ্ধ যাত্রা করতেন।

''প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পালা 'কাঞ্চন কন্যা পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাবে বাঁশির কথা উল্লেখ করেছেন। তরুন রাজা রাজকুমার ও রজক কন্যা কাঞ্চনমালার প্রেমকাহিনী অবলম্বনে আলোচ্য পালাটি রচিত। রাজকুমার কেওয়া বনে বসে মোহন বাঁশি বাজাচ্ছে আর রজক কন্যা কাঞ্চন মালার মন উদাস হয়ে যাচ্ছে। আদি মধ্য যুগের কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কৃষ্ণের বাঁশি রাধার মনকে যেমন উদাস করে দিত আলোচ্য পালায় যেন তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লোকবাদ্য হিসাবে রাজকুমারে মোহন বাঁশির উল্লেখ করেছেন–

"কেওয়া বনে রাজার কুমার বাজায় মোয়ন বাঁশি।
কাপড় শুকায় ধুবার কন্যা মন তার উদাসী।।'' [২৪৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বর্তমান লোকসমাজে লোকবাদ্য হিসাবে বাঁশির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

''কাঞ্চন কন্যা' পালার অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাবে ঢোল এর উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, রাজকুমার ধোপার কন্যা কাঞ্চনমালাকে নিয়ে দেশত্যাগ করে নতুন দেশে আশ্রয় নেয়। সেখানে রাজকুমারী রুক্মিনী পত্র মারফৎ রাজকুমারকে প্রেম নিবেদন করলে রাজকুমার বিদেশ ভ্রমণের কথা বলে কাঞ্চনমালাকে রেখে চলে যায়। কিন্তু তিন মাস পরে রাজকুমারী রুক্মিনীর বাড়িতে রাজকুমার ও রুক্মিনীর বিবাহ উপলক্ষে ঢাক ঢোল ইত্যাদি লোক বাদ্যের আওয়াজ শোনা গেল। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা ছত্রে বলেছেন–

"একমাস দুইমাস তিনমাস যায়।
রাজবাড়িতে বাজে ঢোল শব্দ শোনা যায়।।'' [২৪৬]

এই খণ্ডে 'রাজকন্যা রূপবতী' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাাবে রণডঙ্কা, ঢাক, ঢোল প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। রাজকন্যা রূপবতীর বিবাহ সম্পর্কে সমস্ত সমস্যার অবসান ঘটলে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লোকবাদ্য প্রসঙ্গে বলেছেন–

"বাজে রণডঙ্কা
ঢাক বাজে ঢুল বাজে
আর নাই কোন শঙ্কা।।'' [২৪৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান লোকসমাজে যেকোনো অনুষ্ঠানে লোকবাদ্য হিসাবে ঢাক, ঢোল বাজতে শোনা যায়। এছাড়া পালা রচনার সমসাময়িক কালে রাজা-মহারাজা গণ যুদ্ধ ঘোষণার সময় রণডঙ্কা বাজাতেন।

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'পীর বাতাসী কন্যা' পালায় পালা রচয়িতা রজনী গোপাল লোকবাদ্য হিসাবে নলি বাঁশের তৈরী বাঁশির কথা উল্লেখ করেছেন। পীর বাতাসী কন্যার প্রেমে আত্মহারা বিনাথ নলি বাঁশ কেটে বাঁশি তৈরী করেছে। বাতাসী কন্যাকে উদ্দেশ্য করে বিনাথ বনে বনে ঘুরে বেড়ায় আর বাঁশি বাজায়। বিনাথের বাঁশি বাজানো প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা রজনীগোপাল লোকবাদ্য সম্পর্কে বলেছেন–

"নলি বাঁশ কাইট্যা বিনাথ বাঁশি বানাইল।
বনে বনে বাজায় বাঁশি কন্যারে শুনায়্যা।।'' [২৪৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে ব্যবহৃত লোকবাদ্য বাঁশি লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান লোকসমাজে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় চলেছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'সদাগর কন্যা বগুলা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাবে ঢোল ও সানাই এর উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, সদাগর তার কন্যা বগুলাকে এক রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে চান। কিন্তু বগুলা, বণিক সাধুর পুত্রকে স্বামী হিসাবে অন্তরে স্থান দিয়েছে। অবশেষে সাধুর পুত্রের সঙ্গে বগুলার বিবাহ সম্পন্ন হল। এই বিবাহ উপলক্ষে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লোকবাদ্য সম্পর্কে বলেছেন –

" ঢোল বাজে সানাই বাজে রইয়া রইয়া।
সাধুর পুত্রের সঙ্গে হইল সুন্দর কন্যার বিয়া।।"[২৪৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িককালে উল্লেখিত লোকবাদ্য ঢোল ও সানাই লোকঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান লোকসমাজে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। যেকোনো সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে লোকবাদ্য হিসাবে ঢোল এর শব্দ ও সানাইয়ের সুর শোনা যায়। বর্তমানে যেকোনো বিবাহ অনুষ্ঠানে সানাইয়ের সুর মূর্চ্ছনা আমাদেরকে মোহিত করে।

দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত ''দেওয়ান মদিনা' বা 'আলাল দুলালে'র পালায় পালা রচয়িতা মনসুর বয়াতি লোকবাদ্য হিসাবে ঢাক, ঢোল, সানাই নাকাড়া প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। আলাল ও দুলাল - দুই ভাইয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে যে সমস্ত লোক বাদ্য বেজেছিল সে সম্পর্কে পালা রচয়িতা মনসুর বয়াতি পালার ছত্রে বলেছেন–

"ঢাক ঢুল বাজব কত সানাই নাকাড়া।
আশমানেতে ছুটব হাউই তুমরি ফুলঝরা।।"[২৫০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে ঢাক, ঢোল, সানাই, নাকাড়া ইত্যাদি লোকবাদ্য লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে আধুনিক লোক সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'মনির ওঝা ও মঞ্জুর মাও' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাবে মোহন বাঁশির কথা উল্লেখ করেছেন। পালায় হাছেন ও মঞ্জুর মাও দুজনে দুজনের প্রেমে আত্মহারা। হাছেন যখন বনমধ্যে মোহন বাঁশি বাজায় তখন মঞ্জুর মাও ভাবে তার উদ্দেশ্যেই এই বাঁশি বাজছে। এই প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লোকবাদ্য হিসাবে মোহন বাঁশির উল্লেখ করেছেন–

"আমার উদ্দেশ্যে বন্ধুরে
আরেভালা বাজায় মোহন বাঁশি।"[২৫১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমানে লোকসঙ্গীত ও ধ্রুপদী সঙ্গীতে লোকবাদ্য হিসাবে বাঁশি বাজানো হয়।

'প্রাচীন পূর্ব বঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পালা 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় পালা রচয়িতা নয়ানচাঁদ ঘোষ, রঘুসুত, শ্রীনাথ বানিয়া, দামোদর দাস লোকবাদ্য হিসাবে খোল করতাল বাজানোর কথা বলেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি পিতৃ মাতৃহীন কঙ্ক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গর্গের গৃহে আশ্রয় লাভ করে। গর্গ সন্তান স্নেহে কঙ্ককে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে তোলে। গর্গের কন্যা লীলা যৌবনবতী হয়ে উঠলে প্রতিবেশীরা নানা কুকথা রটনা করে। এরপর গর্গ কঙ্কের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হলে কঙ্ক, গর্গের গৃহত্যাগ করে। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুই শিষ্য বিচিত্র ও মাধবকে কঙ্কের খোঁজ করতে পাঠায়। কোথায় গেলে কঙ্কের খোঁজ পাওয়া যাবে এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতাগণ গর্গের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন–

"যেই না দেশে বাজে প্রভূর খোল করতাল
হরিনামে কাঁপাইয়া আকাশ পাতাল।।

ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সব করে কোলাকুলি।
হরিনামে মত্ত তারা সব ভেদভুলি।।
সেই দেশে কঙ্কেরে তোমরা করিবা অন্বেষণ।
অবশ্য গৌরাঙ্গ ভক্তে পাইবা দরশন।।''[২৫২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার অব্যবহিত পূর্ব কালে প্রচলিত লোক বাদ্য খোল, করতাল সহকারে হরিনাম সংকীর্তন, লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান লোকসমাজে ধর্মীয় জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে প্রবহমান ধারায় বয়ে চলেছে। আলোচ্য পালার বিভিন্ন ছত্রে বারংবার লোকবাদ্য হিসাবে খোল, করতাল, বীণা, বাঁশি প্রভৃতির উল্লেখ আছে। যেগুলি বর্তমান লোকসমাজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'ভেলুয়া সুন্দরী - আমির সাধু' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাবে শিঙ্গার কথা উল্লেখ করেছেন। পালা রচনায় সমসমায়িক কালে মাঝি মাল্লারা বাণিজ্য যাত্রার পূর্বে গভীর রাত্রে শিঙ্গা বাজিয়ে মাঝি মাল্লাদের আহ্বান করত এবং ডিঙ্গা বা নৌকা ছেড়ে দিত। বর্তমানে নদীমাতৃক বঙ্গদেশে মাঝিরা খেয়া পারাপার করার সময় শিঙ্গা বাজিয়ে যাত্রীদের আহ্বান করে থাকে এবং নিজের উপস্থিতির কথা জানায়। বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লোকবাদ্য হিসাবে শিঙ্গার উল্লেখ করেছেন–

"ঘাটের মাঝে বান্ধা থাকে হরেক রকম ডিঙ্গা
মাঝি মাল্লা গহীন রাইতে ফুকারে যে শিঙ্গা।।''[২৫৩]

'ভেলুয়া সুন্দরী - আমির সাধু' পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাবে তার দিয়ে তৈরী সারিন্দার উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর বিবাহের পর আমির সাধু ভেলুয়াকে মা ও বোনের কাছে রেখে বাণিজ্যযাত্রা করে। আমির সাধু বাণিজ্য থেকে ফিরে এসে মা ও বোনের কাছে শুনল যে ভেলুয়া মারা গেছে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ না পেয়ে আমির সাধু ফকির বেশে সারিন্দা বাজিয়ে সর্বত্র ভেলুয়ার খোঁজ করতে লাগল। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লোকবাদ্য হিসাবে সারিন্দার উল্লেখ করেছেন–

"সারিন্দা বাজায় আমির চোগর জল ছাড়ি।
পেটে নাইরে দানাপানি ফিরে বাড়ী বাড়ী।।''[২৫৪]

তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'কমলা কন্যা' পালায় পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান লোকবাদ্য হিসাবে ঢাক, ঢোল ও সানাই-এর উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য পালায় কমলা ও প্রদীপ কুমারের বিবাহ অনুষ্ঠানে যে সমস্ত লোকবাদ্য বাজুনীয়ার দল বাজিয়েছিল সে প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"ঢাক বাজে ঢোল বাজে আর বাজে সানাই।
নাইচ গায়ন হয় কত জুড়িয়া আঙ্গিনায়।।''[২৫৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রচলিত লোকবাদ্য বর্তমান লোকসমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। 'কমলা কন্যা' পালার বিভিন্ন ছত্রে লোকবাদ্য হিসাবে ঢাক, ঢোল, সানাই, শঙ্খ প্রভৃতির ব্যবহার আছে একাধিক বার।

তৃতীয় খণ্ডের 'ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী' পালায় পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাবে কাড়া, নাগ্‌রা, ডঙ্কা, ঢোল, ডম্বুর প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন বারংবার। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি ভারইয়া রাজা সিঙ্গিরাজাকে বন্দী করলে, সিঙ্গি রাজার পুত্র দুধরাজ ভারইয়া রাজ্য আক্রমন করে। ভারইয়া রাজা যুদ্ধ শুরুর

মুহূর্তে কাড়া, নাগ্‌রা ও ডঙ্কায় বাড়ি মারার সঙ্গে সঙ্গে অগণিত বীর পালোয়ানরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে হাজির হয়। দুধরাজ ও ভারইয়া রাজার যুদ্ধ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বিভিন্ন লোকবাদ্যের উল্লেখ করেছেন–

"কাড়া বাজে নাগ্‌রা বাজে ডঙ্কায় মারে বাড়ি।
রাইজ্যের যত বীর পালোয়ান চলে আগু সারি।।"[২৫৬]

পালায় উল্লিখিত এই সমস্ত লোকবাদ্য তৎকালীন রাজা মহারাজারা যুদ্ধ শুরুর পূর্বে বাজাতেন। এই বাদ্যের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত সৈন্যদের আহ্বান করা এবং সমস্ত প্রজাদেরকে সচেতন করা। আমাদের দেশে আজও স্বাধীনতা দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবসে সৈন্য সমাবেশের সময় এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠে।

তৃতীয় খণ্ডের 'শীলা দেবী' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাবে ঢুলি বা ঢোল, জয়ডঙ্কা বা জয়ঢাক, খড়করতাগি বা কাড়া, নাগ্‌রা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি বামুন রাজার পুত্রের সঙ্গে পরগনা রাজার কন্যা শীলাদেবীর বিবাহ হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে বাজুনীয়ার দল যে সমস্ত লোকবাদ্য বাজিয়েছে সে প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন

"বাজুনীয়া আইল কত পইরা নানান সাজে
নানান জাতি বাজুনীয়ার ঢুলের বাদ্যি বাজে।।
উত্তর দেশ হইতে একদফা বাজুনীয়া
জয়ডঙ্কা কান্ধে আইল বিন্নির মুড়ি লইয়া।।
পূব দেশ হতে আইল পূবাইল বাজ্জনি।
খড়কর তাগির সঙ্গে শুনি জয়ঢাকের ধ্বনি।"[২৫৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আলোচ্য পালায় বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাগরা ইত্যাদি লোকবাদ্য বর্তমান লোকসমাজে প্রচলিত বিবাহ অনুষ্ঠানে লোকঐতিহ্যের ধারা পথে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পালা 'রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাবে জয়ঢাক, কাড়া, কাঁসি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে জানা যায় মাজদিয়া গ্রামের কন্যা চন্দ্রকলার বিবাহের পর পিত্রালয়ে গমন করার সময় লোকাচার অনুযায়ী সকলে জয়ধ্বনি করছে এবং নানা রকম লোকবাদ্য বাজছে। এই প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"জয়ঢাক কাড়া কাঁসি বাজিতে লাগিল।
ঘরে ঘরে জয়ধ্বনি সকলে করিল।।"[২৫৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে ব্যবহৃত জয়ঢাক, কাড়া, কাঁসি প্রভৃতি লোকবাদ্য বর্তমান লোকসমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সমান ভাবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

এই একই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাবে খুঞ্জুনির উল্লেখ করেছেন। দুশ্চরিত্রা শ্যামপ্রিয়া বোষ্টমী দূরভিসন্ধি নিয়ে রঙ্গমালা সুন্দরীর বাড়িতে এসেছে। এই সময় বোষ্টমীর হাতে লোকবাদ্য হিসাবে প্রচলিত খুঞ্জুনি বেজে উঠল। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা বলেছেন–

"টুনুর টুনুর করি বোষ্টমী খুঞ্জুনিত্ টোকা দিল।
ছোটো ছোটো নরের পোলা তাম্‌সা চাইতে আইল।।"[২৫৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে ব্যবহৃত লোকবাদ্য খুঞ্জুনি বর্তমান লোকসমাজে হরিনাম

সংকীর্তন বা পদাবলীকীর্তন এমনকি আধুনিক গানের সময় বাজতে শোনা যায়।

চতুর্থ খণ্ডের 'মইষাল বন্ধু-সাঁজুতি কন্যা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাবে বাঁশির উল্লেখ করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃঋণ শোধ করবার জন্য ডিঙ্গাধর বলরাম মহাজনের বাড়িতে চাকরের কাজ নিয়েছে। ডিঙ্গাধর মাঠে মহিষ চরাতে চরাতে বাঁশি বাজায় আর গান গায়। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"নদীর পাড়ে বড়ো মাঠ মইষের বাথান।
মইষ চরায় বাঁশি বাজায় আর গান গায়।।"[২৬০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মহিষ চরাতে চরাতে ডিঙ্গাধরের বাঁশি বাজানোর সুর শুনে আমাদের স্মৃতিতে আদিমধ্য যুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের গোচারণ রত শ্রীকৃষ্ণের ছবি ভেসে ওঠে। লোকবাদ্য হিসাবে বর্তমানে সঙ্গীত জগতে বাঁশির ব্যবহার অপরিহার্য।

এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাবে ঢোল, ডগর, সানাই প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। ডিঙ্গাধর ও সাঁজুতি কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে নানা বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে বিবাহের গীত বেজে উঠল। এ প্রসঙ্গে পালা, রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"ঢুল বাজে ডগর বাজে সানাই বাজে রইয়া।
ডিঙ্গাধরের সঙ্গে হইল সুন্দর কন্যার বিয়া।।"[২৬১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িককালে বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রচলিত লোকবাদ্য ঢোল, ডগর ও সানাই, লোক ঐতিহ্য অনুযায়ী বর্তমান লোকসমাজে আয়োজিত বিবাহ অনুষ্ঠানে সমানভাবে প্রচলিত আছে।

'প্রাচীন পর্ববঙ্গ গীতিকা'র পঞ্চম খণ্ডের 'আন্ধা বন্ধুর বাঁশি' পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি এক অন্ধ ভিখারী বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে নগরের রাজপথে ঘুরে বেড়ায়। বাঁশির ব্যাকুল সুরে আকৃষ্ট হয়ে রাজা তাকে রাজপুরে ডেকে আনেন এবং তার একমাত্র কন্যার বংশী শিক্ষার দায়িত্ব নিতে বলেন। এদিকে আন্ধা বান্ধুর কাছে বংশী শিক্ষা করতে গিয়ে রাজকন্যা মনের অজান্তে আন্ধা বন্ধুকে ভালোবেসে ফেলে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে রাজকুমারীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন–

''বাঁশি বাজাও তুমি রে বন্ধু,
আমারে শিখাও গান।
যেই দিন শুইন্যাছি বাঁশি
কাইড়্যা লইছ পরাণ–"[২৬২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলোচ্য পালার একাধিক ছত্রে লোকবাদ্য হিসাবে বাঁশির উল্লেখ্য আছে। পালায় ব্যবহৃত লোকবাদ্য বাঁশি লোকঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান লোকসমাজে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

'আন্ধা বন্ধুর বাঁশি' পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাবে ঢোল, ডগর ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। পালা রচয়িতা পালায় দেখিয়েছেন, রাজকন্যাকে না জানিয়ে আন্ধা বন্ধু রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে। ভগ্নহৃদয় রাজকন্যাকে দেখে রাজা ও রানী চিন্তামগ্ন হয়ে রাজকন্যার বিবাহের জন্য দেশে দেশে ঘটক পাঠালেন। এরপর রাজকন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা একাধিক লোকবাদ্যের উল্লেখ করেছেন–

"ঢোল বাজে ডগর বাজে
নাচে ডগরিয়া।
কোন দেশের রাজারপুত্র
রাজকন্যারে যায় নিয়া।।"[২৬৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালায় উল্লেখিত লোক বাদ্য ঢোল ও ডগর বর্তমান লোকসমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানে আজ ও ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত 'কবরের কান্না' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকবাদ্য হিসাবে বাঁশের বাঁশি ও শিঙ্গার উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি একদিন রংদিয়ার চরে হার্মাদরা ডাকাতি করতে আসে। তারা আজগরের সমস্ত কিছু নেওয়ার পরে নুরন্নেছা ও মালেককে বেঁধে নৌকায় তুলে নিয়ে চলে যায়। গভীর সমুদ্রে এক বালির চড়ায় জেলেরা হার্মাদ ডাকাতদের কাছ থেকে নুরন্নেছা ও মালেককে উদ্ধার করে। এরপর জেলেরা সবকিছু জেনে তাদেরকে রংদিয়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য রওনা দেয়। এই সময় জেলেরা নাচতে নাচতে বাঁশি ও শিঙ্গা বাজিয়ে রংদিয়ার চরে এসে পৌঁছায়। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা বলেছেন–

"কেউ বাজায় বাঁশের বাঁশি কেউ ফুকে শিঙ্গা।
নাচিতে নাচিতে চলে বোঝাই গধুডিঙ্গা।।"[২৬৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালায় ব্যবহৃত লোকবাদ্য বাঁশি ও শিঙ্গা আজ ও লোকসমাজে সমানভাবে ব্যবহৃত ও প্রচলিত আছে। বর্তমানে বিভিন্ন সঙ্গীত পরিবেশনে বাঁশির ব্যবহার অপরিহার্য। আবার নৌকার মাঝিরা খেয়া পারাপারের সময় শিঙ্গা বাজিয়ে নৌকার যাত্রীদের আহ্বান করে থাকে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত 'ভেলুয়া-সুন্দরী মদন সাধু' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা ডঙ্কা, দামামা প্রভৃতি লোকবাদ্যের উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, আবু রাজা ভেলুয়া-সুন্দরীকে বিবাহ করবার জন্য শুভদিনে ডিঙ্গায় করে ক্ষীরনদী সাওরে রওনা হয়। বিবাহ করতে যাওয়ার সময় আবু রাজার ডিঙ্গায় যে সমস্ত লোকবাদ্য বাজছিল সে প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"বাজি বাজনা লইল রাজা নৌকায় ভরিয়া।
ডঙ্কা দামামা বাজে ডিঙ্গায় বসিয়া।।"[২৬৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালায় উল্লিখিত ডঙ্কা, দামামা প্রভৃতি লোকবাদ্য বর্তমান লোকসমাজে প্রচলিত বিবাহ অনুষ্ঠানে বা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত 'হাতিখেদার গান' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা ভং বা ভেপুর মতো বাদ্যযন্ত্র এবং কাঁসরত্ বা কাঁসর প্রভৃতি লোকবাদ্যের উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য পালায় হাতিখেদার কাজে নিযুক্ত লোকজন হঠাৎ বনের মধ্যে পাতার মড়মড় ধ্বনি শুনে হাতি আসছে এমন আশঙ্কায় নানা রকম লোকবাদ্য বাজাতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"কেহ করে নানান্ ঢং - ওরে নানান্ ঢং।
বাজায় ভং কাঁসরত্ মারে বাাড়ি।।"[২৬৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালায় উল্লেখিত ভং, কাঁসরত্ ইত্যাদি লোকবাদ্য লোকঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পূজা পার্বণে আজও ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত 'মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পালায় মহিলা কবি সুলা লোকবাদ্য হিসাবে বহু প্রচলিত বাঁশির উল্লেখ করেছেন। পালায় আমরা দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুর ধ্বনিত হলে সমস্ত ধেনু বনপথে এগিয়ে চলে, আবার বাঁশির সুর বন্ধ হলে সমস্ত ধেনু দাঁড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"শুনিলে বাঁশির গান ধেনু চলে বনে।
দাঁড়াইয়া আছে তারা তোমার কারণে।।"[২৬৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ষষ্ঠ খণ্ডের একাধিক পালায় লোকবাদ্য হিসাবে বাঁশির উল্লেখ আছে। বিশেষত 'কুমার বীরনারায়ণের পালা'য় বীর নারায়ণকে বাঁশি হাতে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। পালা রচনার সমসাময়িককালে লোকবাদ্য হিসাবে উল্লেখিত বাঁশি লোকঐতিহ্যের হাত ধরে আজও বিভিন্ন সঙ্গীতে বিশেষত লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সপ্তম খণ্ডের অন্তর্গত 'রতন ঠাকুরের পালা'য় নায়ক রতনঠাকুর বাঁশি হাতে করে ঘুরে বেড়ায় আর বৃদ্ধ মালীর কন্যার কাছ থেকে বসন্তবাহার মালা কেনে। এর পর রতনঠাকুর ও মালীর কন্যার মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রেমের সঞ্চার হয়। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

রতন ঠাকুর পন্থে চলে হস্তে লয়্যা বাঁশি।
মালীর ছেড়ী ঘাটে যায় রে
আরে ভালা কাঙ্খেতে কলসী রে–"[২৬৮]

সপ্তম খণ্ডের অন্তর্গত 'সন্নমালার পালায়' অজ্ঞাত পালা রচয়িতা ঢোল, ডগর, ইত্যাদি লোকবাদ্যের উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, রাজকুমারী ও তার সখী সদাগর কন্যা সন্নমালা যখন ফুল বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন রাজকুমার সন্নমালাকে দেখতে পায়। রাজকুমার পূর্বে সন্নমালার রূপের কথা শুনেছিল। এরপর সন্নমালা তার বাপের বাড়ি চলে আসে।রাজকুমার তার বোনকে যে কোনো অছিলায় সন্নমালাকে আনার প্রস্তাব দেয়। রাজকুমারের বোন রাজকুমারী তার সখী সন্নমালাকে আনতে সদাইগরের বাড়ী চৌদোলা পাঠায়। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা ঢোল, ডগর ইত্যাদি লোক বাদ্যযন্ত্রের কথা বলেছেন–

"ঢোল ডগর চৌদোলা গেল সদাইগরের বাড়ী।
সদাইগর সদাই বাড়ীত্ আছ নি?
রাজার কন্যা পাঠাইল লইতে তোমার ঝি।।[২৬৯]

পালায় উল্লেখিত ঢোল, ডগর ইত্যাদি লোকবাদ্য বর্তমান লোকসমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা বিবাহ অনুষ্ঠানে বাজতে শোনা যায়।

সপ্তম খণ্ডের অন্তর্গত 'কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ' পালায় পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী লোকবাদ্য হিসাবে ঢাক ও ঢোলের কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে জানা যায় যে, অপুত্রক রাজা দশরথ মনের দুঃখে অনশনে জীবন ত্যাগ করবেন স্থির করলেন। এমন সময় একজন দীর্ঘকায় মুনি এসে দশরথের হাতে একটি অমৃত ফল দিয়ে বললেন, এই ফল খেলে দেবতার আশীর্বাদে তার পত্নীগণ সন্তান বতী হবেন। এরপর এই অমৃতফল খেয়ে যথাসময়ে দশরথের তিনপত্নী সন্তানসম্ভবা হলেন। এই উপলক্ষে অযোধ্যা বাসী আনন্দে মেতে উঠল। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা ঢাক ঢোল ইত্যাদি লোকবাদ্যের উল্লেখ করেছেন–

"ঢাক ঢোল বাজে রঙ্গে গো, নাচে প্রজাগণ।
ভাণ্ডার খুলিয়া সবেগো, করে ধন বিতরণ।।"[২৭০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালায় উল্লেখিত ঢাক ঢোল ইত্যাদি লোকবাদ্য বর্তমান লোকসমাজে প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা বিবাহ অনুষ্ঠানে আজও বাজতে শোনা যায়।

(ঝ) লোকদেবতা

আদিমযুগে অরণ্যচারী আদিম মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে ভীতিবিহ্বল চোখে দেখতো। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত, বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় যাযাবর অরণ্যাচারী কিংবা গুহাবাসী আদিম মানুষকে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে প্রভাবিত করেছিল। আত্মরক্ষার তাগিদে অরণ্যচারী আদিম মানুষ প্রাকৃতিক নানান বিপর্যয়কে অমোঘ শক্তিরূপে ভাবতে শুরু করে। আর এই ভাবনা থেকেই একসময় অমোঘ শক্তিগুলিকে তুষ্ট করবার জন্য অরণ্যচারী আদিম মানুষ প্রথম পূজা-অর্চনা শুরু করে। পরবর্তী কালে এই কল্পিত শক্তির উপর বিশ্বাস জন্মালে অরণ্যচারী মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর সাকারে পূজা করতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে ড. দুলাল চৌধুরী যথার্থই বলেছেন–

"গাছ, গাছের গুঁড়ি, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পল্লব, পাথর শিলানুড়ি,
ছলন, চালি, দেবমুণ্ড, পশু, জল, জলাশয়, পাহাড়, দণ্ড (আশাদত্ত),
নরকপাল, যূপকাষ্ঠ, বৃষকাষ্ঠ, নরপশু বা নরনারী, আকাশ, সূর্য,
থান, ফসল, প্রতীক আর অসংখ্যা জড়বস্তু দেবতার সাম্মানিক
আসন অলঙ্কৃত করেছিল। কালক্রমে ক্ষেত্রদেবতা, ক্ষেত্রপাল,
দিগ্‌রক্ষক, উর্বরতার মাতৃদেবতা, অন্তরীক্ষের দেবতা ইত্যাদি
বহুদেবতার জন্ম হয়েছে লোকসমাজে।।"[২৭১]

অধুনা নদীমাতৃক বঙ্গদেশে গ্রামীণ মানুষজন প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে, রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে, নিঃসন্তানের সন্তান কামনায়, সন্তানের মঙ্গল কামনায়, কৃষির উন্নতি কামানায় নানা লোকদেবতার আরাধনা করে থাকে। ক্রমান্বয়ে লোকদেবতার উপর বিশ্বাস দৃঢ় হলে লোকদেবতার আসন ও স্থায়ী হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে লৌকিক দেবদেবীগণ কোথাও তিন রাস্তার মোড়ে, কোথাও অশ্বত্থ গাছের নিচে, কোথাও চালাঘরের মধ্যে লোকজ বিশ্বাসানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে পূজিত হন। বঙ্গদেশে পূজিত লৌকিক দেবদেবীগণের মধ্যে ধর্মঠাকুর, মহাকাল, মন্থনী, ভীমসেন রায়বাঘিনী, জয়চণ্ডী, মনসা, চণ্ডী, বনদূর্গা, দক্ষিণরায়, বনবিবি, পদ্মা, কামাক্ষী, তিরকুটেশ্বরী, খোয়াজখিজির, সত্যপীর, শালগ্রামশিলা, মা বুড়া ছিরিমাই, ফরা, বিষহরি, শীতলা, ষষ্ঠী, জয়কালী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সাতটি খণ্ডের বিভিন্ন পালায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে সমস্ত লোকদেবতা বা লৌকিক দেবদেবীর কথা' উঠে এসেছে নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল–

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডের প্রথম পালা 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায় পালা রচয়িতা দ্বিজ কানাই লোক দেবতা হিসাবে কার্তিক ঠাকুরের কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, হুমরা বেদে রাতের অন্ধকারে, মহুয়াকে নিয়ে পলায়ন করলে, নদ্যার চাঁদ মহুয়ার খোঁজে দেশান্তরী হয়ে যায়। নদ্যার চাঁদের মঙ্গল কামনায় তার মা কার্তিক মাসে কার্তিকব্রত পালনের কথা বলেছে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা বলেছেন–

"কাত্তিক মাসে কাত্তিক বর্‌ত পুত্রের লাগিয়া।
আঙ্খি ঘোর হইল মায়ের কান্দিয়া কান্দিয়া।।"[২৭২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রচলিত কার্তিক ব্রত বর্তমান লোক সমাজে আজ ও প্রচলিত আছে। লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে আজও বাঙালি ঘরের পিতা মাতারা তাদের সন্তানদের মঙ্গল কামানায় কার্তিক মাসে কার্তিক ব্রত পালন করে থাকেন।

প্রথম খণ্ডের 'সুন্দরী মলুয়া' পালায় পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী লোকদেবী হিসাবে মনসা দেবীর নাম উল্লেখ করেছেন। পালা রচনার সমসাময়িককালে পালা রচয়িতাগণ পালা রচনার সূচনায় দেবদেবীর বন্দনা করতেন। পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী তাঁর 'সুন্দরী মলুয়া' পালার সূচনায় লোকদেবী মনসার বন্দনা করেছেন। পালা রচনার সমসাময়িকালে সর্পের হাত থেকে রক্ষা পেতে মানুষ মনসা দেবীর পূজা করত। মধ্যযুগে মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পের হাত থেকে রক্ষা পেতে চাঁদ সদাগরকে শেষ পর্যন্ত মনসা দেবীকে পূজা দিতে হয়েছিল। পালার বন্দনা অংশে পালা রচয়িতা বলেছেন–

"মনসা দেবীরে বন্দুম্‌ আস্তিকের মাতা।
যাহার বিষের তেজ ডরায়েন বিধাতা।।"[২৭৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান লোকসমাজে আজ ও সর্পের হাত থেকে রক্ষা পেতে বঙ্গদেশের সর্বত্র মানুষ মনসাকে লৌকিক দেবী হিসাবে পূজা করে থাকে।

'সুন্দরী মলুয়া' পালার বন্দনা অংশ ছাড়াও পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী, পালার অন্যত্র লোকিক দেবী মনসার উল্লেখ করেছেন। পালায় প্রবেশ করে আমরা জানতে পারি, উপার্জনের জন্য পালার নায়ক চাঁদবিনোদ পৌষমাসে বিদেশ যাত্রা করে। এদিকে সাত মাস অপেক্ষা করেও মলুয়া তার স্বামী চাঁদবিনোদের কোনো খবর পেল না। স্বামী বিরহে কাতর মলুয়া স্বামীর মঙ্গল কামনায় শ্রাবণ মাসে মনসার মন্দিরে মানত করে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"ঢাক ঢুল বাজে কত
মনসার মন্দিরে।
দেবতার পায় মলুয়া
মনে মানত করে।।"[২৭৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে মানুষ মনসাকে শুধুমাত্র কোপন স্বভাব সর্পদেবী হিসাবে পূজা করত না, মঙ্গলময়ী দেবী হিসাবেও পূজা করত।

প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত 'চন্দ্রাবতী পালা'য় পালা রচয়িতা নয়ান চাঁদ লৌকিক দেবী শ্যামা ও বনদূর্গা এবং লৌকিক দেবতা গণেশের উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, বৈশাখ মাসের শুভ দিনে চন্দ্রাবতীর বিবাহের দিন স্থির হয়। এই বিবাহের মঙ্গল কামনায় উপরোক্ত লৌকিক দেব-দেবীর পূজা করা হয়। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"একে একে কৈল্য পূজা যত দেব আর।
শ্যামাপূজা একচূড়া বনদূর্গা মার।।" [২৭৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান লোক সমাজে আজ ও বিবাহের মঙ্গল কামনায় শ্যামা, একচূড়া বা গণেশ ও

বনদূর্গার পূজা করা হয়।

প্রথম খণ্ডের 'কেনা ডাকাতের পালা'য় পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী লৌকিক দেবী হিসাবে চতুর্ভূজ ত্রিনয়নী পদ্মার নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, জালিয়া বন্দরের কাছে বাকুলিয়া গ্রামে অপুত্রক খেলারাম বাস করত। খেলারামের স্ত্রী যশোধারা একদিন স্বপ্নে চতুর্ভূজ ত্রিনয়নী দেবী পদ্মাকে দেখতে পান। দেবীর আদেশে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে খেলারাম ও যশোধারা পদ্মার পূজা দেন এবং অনতিবিলম্বে পুত্রবতী হন। আর এই পুত্রের নামই দস্যু কেনারাম। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রাবতী তাঁর পালায় বলেছেন—

"দেখিল শিয়রে কে দেবী অধিষ্ঠান।
চতুর্ভূজ ত্রিনয়নী পদ্মা মূর্তিমান।।'' [২৭৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান লোকসমাজে আজও সন্তান কামনা করে দেবী পদ্মার পূজা করা হয়। এই পদ্মা আসলে দেবী মনসা। পালার অন্তর্গত অন্য একটি ছত্রে এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী বলেছেন—

"চন্দ্রাবতী কয় শুন অপুত্রার ঘরে।
সুন্দর ছাওয়াল হইল মনসার বরে।।''[২৭৭]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পালা 'কাঞ্চন কন্যা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকদেবতা হিসাবে দেওয়া বা মেঘের দেবতার উল্লেখ করেছেন। পালায় আমরা দেখতে পাই, কাঞ্চন কন্যা আত্মবিসর্জেনের জন্য যখন নদীর ঘাটে যাচ্ছে তখন বৃষ্টি পড়ছে আর মেঘ গর্জন করছে। এই প্রসঙ্গে পালার রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন—

"দেওয়ায় ডাকে ঘন ঘন
বিষ্টি পড়ে রাইয়া।
নদীর ঘাটে আইলা কাঞ্চন
এইবার শেষের লাগিয়া।।'' [২৭৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচয়িতা মেঘগর্জন কে থামানোর জন্য মেঘের দেবতা 'দেওয়ার' উল্লেখ করেছেন। ''কাঞ্চন কন্যা' পালার একাধিক ছত্রে এই দেওয়ার বা মেঘের দেবতার উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের 'কমলা রাণীর পালা'য় পালা রচয়িতা কবি অধরচাঁদ লৌকিক দেবী হিসাবে ত্রিকুটেশ্বরী দেবীর নাম উল্লেখ করেছেন। ত্রিকুট পাহাড়ে এই ত্রিকুটেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে। মানুষ পাহাড়ে উঠে নিজের বা অপরের মঙ্গল কামনায় এই লোকদেবীর পূজা করে থাকেন। পালা রচয়িতা অধর চাঁদ পালার ছত্রে বলেছেন—

"যুগীগুপা ছাইড়া ডিঙ্গা আইল তিরকুটির ঘাটে।
তিরকুটেশ্বরী দেবী আছুইন তিরকুটি পাহাড়ে।।''[২৭৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ক্রিকুট পাহাড়ে আজও ত্রিকুটেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে। ভক্তরা অতিকষ্টে পাহাড়ে উঠে সকলের মঙ্গল কামানায় এই দেবীর পূজা দেন।

'কমলা রানী'র পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা অধরচাঁদ লোকদেবী হিসাবে কামাক্ষী মাতার নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারি, কমলার বিবাহ নিয়ে নানা জটিলতা চলছিল। কামাক্ষী মাতার দয়ায় কমলার বিবাহের কথা স্থির হয়। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছন—

"কামাক্ষী মাতার দয়া হইল কমলার উপর।

বিয়ার কথা থির হইল আনন্দ অন্তর।।''[২৮০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে বিবাহ সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষ লৌকিক দেবী কামাক্ষী মাতার পূজা করত। বর্তমান লোকসমাজে আজ ও মানুষ বিবাহ সমস্যার সমাধানের জন্য নানা লৌকিক দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করে থাকেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'সদাগর কন্যা বগুলা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লৌকিক দেবী হিসাবে মনসার উল্লেখ করেছেন। পালার নায়িকা বগুলা শ্রাবণ মাসে সমুদ্রের উথাল-পাথাল জলকে শান্ত করতে লৌকিক দেবী মনসার পূজা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"শাওন বাওনা মাস আথাল পাথাল পানি।
মনসা পূজিতে কন্যা হইল উতযোগিনী।।''[২৮১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে মনসাদেবী শুধুমাত্র সর্পের দেবী হিসাবে পূজিত হতেন না। কোথাও সন্তান কামনায়, কোথাও সমুদ্রের ঢেউকে শান্ত করবার বাসনায় কোথাও মানুষের মঙ্গল কামনায় মানুষ মনসা দেবীর পূজা করত।

দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'আমিনা বিবি ও নছর মালুম' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক দেবতা হিসাবে খোয়াজ খিজির বা সমুদ্রের পীরের নাম উল্লেখ করেছেন। মুসলমান সম্প্রদায় এই লোকদেবতাকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে। বাণিজ্য যাত্রার সময় সমুদ্রের সমস্ত রকমের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমান ও হিন্দু - দুই সম্প্রদায়ই সমুদ্রের পীর খোয়াজ খিজিরের নাম স্মরণ করে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা বলেছেন–

"আশমানের অবস্থা দেখি মাথা নাই থির।
বেকায়দায় ফেলায় বুঝি খোয়াজ খিজির।।''[২৮২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান লোক সমাজে আজ ও হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় ব্যবসা বাণিজ্যের সময় নদী পথে বা সমুদ্রেপথে যেকোনো রকম বিপদের আশঙ্কা দেখলেই সমুদ্রের পীর খোয়াজ খিজিরের নাম স্মরণ করে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পালা 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় পালা রচয়িতাগণ লোকদেবতা হিসাবে সত্যপীরের নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, পালার নায়ক কঙ্কের বাঁশির সুর শুনে এক মুসলমান পীর মোহিত হয়ে তাকে দীক্ষা দান করলেন। ধর্মে মতি সুপণ্ডিত কঙ্ককে সেই মুসলমান পীর সত্যপীরের পাঁচালী রচনার আদেশ করলেন। গুরুর আদেশ মেনে কঙ্ক সত্যপীরের পাঁচালী লিখলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সত্যপীর আসলে সত্যনারায়ণ। পরিবারের সমস্ত রকম মঙ্গল কামনায় সত্যপীরের পূজা করা হয়। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতাগণ পালার ছত্রে বলেছেন–

''যেই পূজে সত্যপীরে কঙ্কের পাঁচালী পড়ে
দেশে দেশে কঙ্কের গুণ গায়।''[২৮৩]

উল্লেখ্য যে পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রচলিত সত্যপীরের পাঁচালী বর্তমানে লোক সমাজে সত্যনারায়ণের পাঁচালী রূপে খ্যাত। হিন্দু মুসলমান – দুই সম্প্রদায়ই সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাঠ করে। বর্তমান লোক সমাজে গৃহের সমস্ত রকম মঙ্গল কামনায় এবং নতুন গৃহে প্রবেশের সময় মানুষ সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের পূজা করে থাকে।

'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালার অন্যত্র পালা রচয়িতাগণ লোকদেবতা হিসাবে শালগ্রাম শিলার নাম উল্লেখ করেছেন। পালায় প্রবেশ করে আমরা জানতে পারি, জাতিনাশের কারণে লীলার পিতা গর্গ দুষ্ট লোকের চক্রান্তের শিকার হয়ে ধার্মিক কঙ্ককে হত্যা করার চেষ্টা করল। লীলার কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে কঙ্ক গৃহত্যাগ করবে স্থির করল। গৃহত্যাগ করার পূর্বে কঙ্ক লীলাকে নিয়মিত লোকদেবতা শালগ্রাম শিলার পূজা করতে বলল। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতাগণ পালার ছত্রে বলেছেন–

গৃহের দেবতা রইল লীলা
শালগ্রাম শিলা।
শুদ্ধমনে দেবপূজা করিও তিন বেলা।।''[২৮৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে মানুষ গৃহের দেবতা হিসাবে লোকদেবতা শালগ্রাম শিলার পূজা করত। বর্তমান লোকসমাজে আজ ও মানুষ গৃহের মঙ্গল কামনায় গৃহদেবতার পূজা করে থাকে।

তৃতীয় খণ্ডের 'ভেলুয়া-সুন্দরী ও আমির সাধু' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকদেবতা হিসাবে মুসলমান পীর বদরের নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, মানিক সদাইগরের পুত্র আমির সাধু বাণিজ্যে যাওয়ার সময় নৌকার মাঝি মাল্লারা নৌকার নিরাপত্তা বিধানকারী লোকদেবতা বদরের নামে জয়ধ্বনি করে নৌকা ছেড়েছে। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বলেছেন–

"বদর বদর নাম লইল মাঝি মাল্লাগণ।
ছুটিয়া চলিল ডিঙ্গা তুরিত গমন।।''[২৮৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পালা রচনার সমসাময়িক কালে উল্লিখিত মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক দেবতা পীর বদর জলযানের নিরাপত্তা বিধানকারী দেবতা হিসাবে পূজিত হতেন। লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান লোকসমাজে আজও জলযানের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ লোকদেবতা হিসবে পীর বদরের পূজা করেন বা তার নামে জয়ধ্বনি করেন।

'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধু' পালার অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদেবতা হিসাবে পীর গাজী ও কালুর নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, আমির সাধু বাণিজ্যে গিয়ে গভীর সমুদ্রে প্রবল ঢেউয়ের কবলে পড়েন। মাঝদরিয়ায় নৌকা পথ হারিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। এইরকম বিপদের মধ্যে পড়ে দিশেহারা আমির সাধু বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য লোকদেবতা গাজী ও কালুকে সিন্নি সহ পূজা দেওয়ার কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

আমির সাধু বলে "এইবার পৌঁছিলে মোকামে।
হাজার ট্যাকার সিন্নি দিয়ম গাজী কালুর নামে।।''[২৮৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাণিজ্য যাত্রায় গিয়ে সমুদ্রের সমস্ত রকম বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পালা রচনার সমসাময়িক কালে মানুষ কালু, গাজী, বদর প্রভৃতি সমুদ্রের পীরকে পূজা দিত ও স্মরণ করত। বর্তমান লোকসমাজে সমুদ্রের সমস্ত রকম বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় লোক দেবতা হিসাবে বদর, কালু, গাজী, প্রভৃতি পীরকে স্মরণ করে ও পূজা করে। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সম্রাট বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে উল্লেখিত সমুদ্রের পাঁচ পীরের নাম স্মরণযোগ্য। সেখানে আমরা দেখি নৌকার মাঝি মাল্লারা দরিয়ার পাঁচ পীরের (সামসুদ্দিন, গিয়াসুদ্দিন, গাজী, কালু, বদর) নামে জয়ধ্বনি করে গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।

তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'কমলা কন্যা' পালায় পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান লোকদেবী হিসাবে বনদুর্গার নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারি, বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় কারকুন প্রথমে কমলা কন্যার বাবা ও ভাই কে দয়াল রাজার দরবারে বন্দী করায় এবং পরে কমলা কন্যাকে ঘরছাড়া করে। কমলা কন্যা মাকে নিয়ে মামার বাড়িতে আশ্রয় নিলে কারকুনের চক্রান্তে সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়। কমলা কন্যা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে কারুর সঙ্গে দেখা না করে রাতের অন্ধকারে লোকদেবী বনদুর্গাকে স্মরণ করে দিশাহীন ভাবে পথে বেরিয়ে পড়ে, এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান পালার ছত্রে বলেছেন—

"বনদুর্গা স্মরি কন্যা
পন্থে মেলা করে।
পইড়্যা রইল মাও মামী
না জিগাইল ফিরে।।"[২৮৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িককালে মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়ে দিশা হীন হয়ে পড়লে লোকদেবী বনদুর্গাকে স্মরণ করে পূজা করত। বর্তমান লোক সমাজে মানুষ বিপদগ্রস্ত হলে দুর্গতি নাশিনী দুর্গার নাম স্মরণ করে।

'কমলা কন্যার পালা'র অন্যত্র পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান লোক দেবী হিসাবে রক্ষাকালীর নাম উল্লেখ করেছেন। এই দেবীকে নর বলি দিয়ে পূজা করলে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, কারকুনের চক্রান্তে কমলা কন্যার পিতা ও ভ্রাতা দয়াল রাজার দরবারে বন্দী হয়। রাজ্যের মঙ্গল কামনায় সমস্তরকম বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দয়ালরাজা নরবিল দিয়ে রক্ষাকালী পূজা করবেন। এই উদ্দেশ্যে রাজপুরীতে বাদ্য বাজছে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান পালার ছত্রে বলেছেন—

"কিসের বাদ্য বাজে আইজ রাজার পুরী মাঝে।
নর বলি দিয়া রাজা রক্ষাকালী পূজে।।"[২৮৮]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রচলিত লোকদেবী রক্ষাকালী পূজা লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান লোকসমাজে আজও প্রচলিত আছে।

'কমলা কন্যা পালা'র অন্য ছত্রে পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান লৌকিক দেবদেবী হিসাবে একচুড়া বা গণেশ এবং বনদুর্গার নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, কমলা কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানের মঙ্গল কামনায় বিধিমতে গণেশ ও বনদুর্গার পূজা করা হয়।

এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে লোকিক দেবদেবী হিসাবে গণেশ ও বনদুর্গার নাম উল্লেখ করেছেন—

"বিধিমত হইল কত দেবতা পূজন।
বনদুর্গা একচুড়া খোলা কীর্তন।।" [২৮৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা বচনার সমসাময়িক কালে বিবাহের মঙ্গল কামনায় একচুড়া ও বনদুর্গার পূজা করা হত। লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান লোকসমাজে আজ ও বিবাহের মঙ্গল কামনায় নানা পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা করে হয়।

তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'সুনাই সুন্দরী পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লৌকিক দেবী হিসাবে মা মনসার নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, দুর্বৃত্ত দেওয়ান ভাবনার হাত থেকে সুনাই সুন্দরীকে রক্ষা করে মাধব তাকে বিবাহ করে। এরপর দেওয়ান চক্রান্ত করে মাধবের পিতাকে বন্দী করে। পিতার উদ্ধারের

জন্য মাধব আষাঢ় মাসে বাণিজ্য যাত্রা শুরু করে। এদিকে সুনাই সুন্দরী মাধবের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে। এরপর সুনাই সুন্দরী শ্রাবণ মাসে মাধব ও মাধবের পিতার মঙ্গল কামনায় লোকদেবী মনসার পূজা করে। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"শাওন মাসেতে দূতী
আমি পূজিলাম মনসা।
সেইতে না পূরিল সইগো
আমার মনের আসা।।"[২৯০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে পূজিত লোকদেবী মা মনসা লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান লোকসমাজে আজ ও সমানভাবে পূজিত হয় চলেছেন।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্গত 'রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লৌকিক দেবী জয়মাকালীর নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, রঙ্গমালা সুন্দরী, শ্যামপ্রিয়ার কাছে রাজচন্দ্রকে লেখা চিঠি পাঠানোর সময় জয়কালীর নাম লিখে দেয়। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"পরথমে লিখিল রঙ্গ জয়মাকালী নাম।
তারপর লিখিল রঙ্গ চরণে হাজার পরণাম।।"[২৯১]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে মানুষ চিঠি লেখার শুরুতে লোকদেবী জয়কালীর নাম লিখত। লোক ঐতিহ্য অনুসারে বর্তমান লোকসমাজে ও মানুষ চিঠি লেখার শুরুতে ইষ্টদেবতার নাম লেখে।

'রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই' পালার অন্য একটি ছত্রে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা মঘ সম্প্রদায়ের লোকদেবতা ফারার নাম উল্লেখ করেছন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, রঙ্গমালার দীঘি খননের কাজ শুরু করার সময় রম্যা মঘের নেতৃত্বে সমস্ত মঘ শ্রমিকরা লোকদেবতা ফারার নামে জয়ধ্বনি করেছিল। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"এই বলি রম্যা মগ হুকুম করি দিল।
ফারা ফারা জিগির ধরি দীঘির কোব ধরিল।।"[২৯২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান লোকসমাজে যেকোনো সম্প্রদায়ের মানুষ কোনো দলবদ্ধ কাজ শুরু করার আগে তাদের ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে।

চতুর্থ খণ্ডের 'মানিকতারা ডাকাইত পালা'য় কবি সেখ আমির উদ্দিন লোকদেবী হিসবে বুড়ো ঠাকরাইনের নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, গভীর রাতে কানু এসে বাসুকে ডেকে নিয়ে যায়। আর কোনো এক অজানা আশঙ্কায় বাসুর মা বাসুর মঙ্গল কামনা করে বুড়ো ঠাকরাইন দেবীর কাছে মানত করে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"দোহাই দেই বুড়ো ঠাকরাইন।
আমার বাসুরে ভালা রাইবাইন।।"[২৯৩]

পালা রচনার সমসাময়িককালে বিপদের আশঙ্কায় মানুষ লোকদেবী বুড়ো ঠাকরাইনের কাছে মানত করত। বর্তমান লোক সমাজেও মানুষ কোনো বিপদের আশঙ্কা করলে নানা লৌকিক দেবদেবীর কাছে মানত করে

থাকে।

চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্গত 'মইষাল বন্ধু সাঁজুতি কন্যা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লৌকিক দেবী মা মঙ্গল চণ্ডীর নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, বলরাম মহাজনের একমাত্র কন্যা সাঁজুতির বিবাহের মঙ্গল কামনায় সাঁজুতির মা লৌকিক দেবী মঙ্গল চণ্ডীর পূজা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

''মঙ্গল চণ্ডী পূজে মাও বিয়ার লাগিয়া।
হিরাজিরীর ফুলপাতা রাখিত তুলিয়া।।''[২৯৪]

'মইষাল বন্ধু সাঁজুতি কন্যা' পালার অন্য একটি ছত্রে পালা রচয়িতা লোকদেবতা হিসাবে পবন দেবতার নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, বলরাম মহাজনের কন্যা নদীর ঘাটে স্নান করতে গেলে নদীর স্রোতে তার কলসী ভেসে চলে যায়। এসময় সাঁজুতি কন্যা কলসী ফিরে পাওয়ার জন্য লোকদেবতা পবনদেবের নাম স্মরণ করল। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"আরে আশমানের দেবতা পওন
তুমি উজান বওয়াও পানি।
সুতের কলসী দয়া কইরা
ঘাটে দাও রে আনি।।''[২৯৫]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে মানুষ যে পবন দেবতার পূজা করত লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান লোকসমাজে আজও মানুষ পবন দেবতার পূজা করে থাকে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত 'কমল সদাইগরের পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লৌকিক দেব-দেবী হিসাবে তুলসী, ষষ্ঠী, বসুমতী, মনসা, ভদ্রাকালী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, ধনী কমল সদাইগরের স্ত্রী শুদ্ধমতী সুরঙ্গিনী সংসারের মঙ্গল কামনায় একাধিক লৌকিক দেবদেবীর পূজা করে থাকে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"বৈশাখ মাসে তুলসী বিরিক্ষে বান্ধি দেয় ঝরা।
জষ্টি মাসে ষষ্টি পূজা আর পূজে তারা।।
আষাঢ় মাসে পূজা করে মাতা বসুমতী।
শাওনে মনসা পূজে আর পড়ে পুঁথি।।
ভাদ্দর মাসে ভদ্দর কালীর কইরা থাকে পূজা।।''[২৯৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে পূজিত তুলসী, ষষ্ঠী, বসুমতী মনসা, ভদ্রাকালী প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবী লোকঐতিহ্যের হাতধরে বর্তমান লোকসমাজে আজও পূজিত হবে চলেছেন।

'কমল সদাইগরের পালা'র অন্য একটি ছত্রে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকদেবতা হিসাবে চন্দ্র ও সূর্য দেবতার নাম উল্লেখ করেছেন। পালায় আমরা দেখি কমল সদাইগরের স্ত্রী সুরঙ্গিনী সংসারের মঙ্গল কামনায় প্রতিমাসে কোনো না কোনো লোকদেবতার পূজা করে থাকে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"পৌষ মাসে পূজা করে চন্দ্র হেন দেবা।
মাঘ মাসে সূর্য পূজা দিয়া রক্ত জবা।।'' [২৯৭]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে মানুষ যেমন মঙ্গল কামনায় চন্দ্র, সূর্য কে লোকদেবতা হিসাবে পূজা করতো, লোকঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান লোক সমাজে আজও মানুষ তেমনি ভাবে চন্দ্র, সূর্যকে পূজা করে চলেছে।

'কমল সদাইগরের পালা'র অন্যত্র পালা রচয়িতা মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদেবতা হিসাবে বদর এর নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি স্ত্রী সরঙ্গিনীর মৃত্যুর পর কমল সদাইগর সকলের অনুরোধে দুই পুত্রের দেখা শুনার জন্য ধর্মপুর গ্রামের ধর্মমণির কন্যা সোনাইকে বিবাহ করে। এই দ্বিতীয় স্ত্রী সোনাই চক্রান্ত করে কমল সদাইগরকে বাণিজ্যে পাঠায়। বাণিজ্য যাত্রার সময় কমল সদাইগরের মাঝি মাল্লারা লোকদেবতা বদরের নামে জয়ধ্বনি দেয়। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন—

"মালুম মাঝি যত আছে ছুয়ানি টেণ্ডল।
বদর সুমরি তলে জাহাজের লঙ্গর।।"[২৯৮]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে বাণিজ্য যাত্রার সময় মাঝি মাল্লারা সমুদ্রের সমস্ত রকম বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোকদেবতা সমুদ্রের পীর বদর এর নাম স্মরণ করে জয়ধ্বনি করত। বর্তমান লোকসমাজে আজ ও বাণিজ্য যাত্রার সময় হিন্দুও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ সমুদ্রের পীর বদরকে স্মরণ করে জয়ধ্বনি করে।

পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত 'ছুরত জামাল-অধুয়া সুন্দরী' পালায় পালা রচয়িতা ফৈজু ফকির লোকদেবী চণ্ডীর নাম উল্লেখ করেছেন। পালা অনুসন্ধান করে আমরা জানতে পারি, দুবরাজের কন্যা অধুয়া সুন্দরী আলালের পুত্র জামালকে দেখে মোহিত হয়ে পত্র মারফত্ প্রেম নিবেদন করল। এরপর জামাল অধুয়া সুন্দরীকে বিবাহ করতে চাইলে দুবরাজ চক্রান্ত করে জামালকে বাইন্যাচঙ্গ শহরে যুদ্ধ করতে পাঠায়। জামালের পত্র মারফৎ একথা জানতে পেরে অধুয়া সুন্দরী জামালের মঙ্গল কামনায় চণ্ডীপূজা করে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা ফৈজুফকির পালার ছত্রে বলেছেন—

"গলায় কাপড় বান্ধি অধুয়া-সুন্দরী।
চণ্ডীরে করয়ে পূজা যতন যে করি।।"[২৯৯]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় মানুষ যেমন লোকদেবী চণ্ডীকে পূজা করত, বর্তমান লোকসমাজে আজ ও তেমনি প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় মানুষ চণ্ডীর পূজা করে।

পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত 'কবরের কান্না' পালায় আজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকদেবতা শিলক ঠাকুর এবং লৌকিকদেবী মা বুড়া ছিরিমাই এর নাম উল্লেখ করেছেন। এই মা বুড়া ছিরিমাই আসলে ছিরমাই নদীর দেবী এবং শিলক ঠাকুর আসলে শিলক নদীর দেবতা। 'কবরের কান্না' পালার বন্দনা অংশে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বলেছেন—

''চাষখোলা গেরামে মানম্ মা-বুড়া-ছিরিমাই।
রাগন্যার ইছামতী শিলক ঠাকুর ভাই।।" [৩০০]

পালারচনার সমসাময়িক কালে বিভিন্ন নদীর বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া জন্য মানুষ বিভিন্ন নদীর নামে লোকদেবতা কল্পনা করত। এবং লোকদেবতার নাম স্মরণ করে নানা বিপদ থেকে রক্ষাও পেত। বর্তমান লোকসমাজে আজও গঙ্গা নদীর থেকে আগত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ গঙ্গা দেবীকে স্মরণ করে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত 'ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা

লোকদেবতা হিসাবে শনি ঠাকুরের নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, উজানী নদীর তীরে শঙ্খপুর গ্রামে মুরাই নামে এক সাধু বাস করতেন। তিনি লোকদেবতা শনি ঠাকুরের পূজা করে সদাইগরদের মধ্যে রাজার আসন লাভ করেছেন। শনি দেবতা কে পুজায় তুষ্ট করে মুরাই সাধু ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি করেন এবং মদন নামে পুত্র সন্তান লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"কইরা যে শনির পূজা হইছে সদাইগরের রাজা
এমুন ধনী তিরভূবনে নাইরে।।"[৩০১]

অথবা

"কইরা যে শনির পূজা রে,
সাধু পাইছে এত ধন।।
পূন্নমাসীর চান পুত্তুর রে,
ও তার নাম যে মদন।।"[৩০২]

'ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা'র অন্য একটি ছত্রে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকদেবী হিসাবে মা মনসার নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, কাঞ্চন নগরের বিখ্যাত মানিক সদাগরের এক মাত্র কন্যা ভেলুয়া সুন্দরীর বিবাহের জন্য পাত্রের খোঁজ চলছে। এ প্রসঙ্গে মানিক সদাগর মনসা দেবীর কৃপায় কন্যার নারায়ণের মতো পাত্র হবে বলে মনে করেন। অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"রূপে গুণে কইন্যা আমার লক্ষ্মীর সোমান।
মনসা দেবী আইনা দিব বর দেব নারায়ণ।।"[৩০৩]

পালা রচনার সমসাময়ি কালে মানুষ লোকদেবী মনসাকে মঙ্গলময়ী দেবী হিসাবে কল্পনা করতনে। কিন্তু মনসা মঙ্গল কাব্যে আমরা মনসাকে প্রতিহিংসা পরায়ণা দেবী হিসাবে দেখেছি। বর্তমান লোকসমাজে অবশ্য মানুষ সর্পের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মনসাদেবীর পূজা করে থাকে।

ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত 'বাইন্যা বউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা গঙ্গা, মঙ্গলচণ্ডী, সত্যনারায়ণ, গন্ধেশ্বরী প্রভৃতি লৌকিক দেব-দেবী নাম উল্লেখ করেছেন। বাইন্যা বউ এর স্বামী বাণিজ্যের জন্য বিদেশ যাত্রা করবে। স্বামীর মঙ্গল কামনায় বাইন্যা বউ গঙ্গা, মঙ্গলচণ্ডী, গন্ধেশ্বরী প্রভৃতি লৌকিক দেবীর পূজা করছে এবং লোক দেবতা সত্যানারায়ণের পূজা করছে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"গঙ্গা পূজা মঙ্গলচণ্ডী আর সত্যনারায়ণ
গন্ধেশ্বরী দেবী পূজে ভক্তি কইরা মন।।"[৩০৪]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে ব্যবসা বাণিজ্যের মঙ্গল কামনায় মানুষ গঙ্গা, মঙ্গলচণ্ডী, গন্ধেশ্বরী প্রভৃতি লোকদেবীর পূজা করত এবং লোকদেবতা সত্যনারায়ণের ও পূজা করত। বর্তমান লোকসমাজে আজও ব্যবসা বাণিজ্যের মঙ্গল কামনায় মানুষ উপরোক্ত দেবদেবীর পূজা করে থাকে।

''বাইন্যা বউ-লক্ষ্মীর ঝাঁপি' পালার অন্য কয়েকটি ছত্রে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকদেবতা হিসাবে দক্ষিণরায় এবং লোকদেবী হিসাবে গঙ্গা, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, প্রথম বার বাণিজ্য যাত্রায় গিয়ে বাইন্যা বউ এর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, ডুবে যায় তার সপ্ত ডিঙ্গা। এর বারো বৎসর পর বাইন্যা বউ এর লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিজেদের নদীর ঘাটে ফিরে আসে। আবার নতুন ডিঙ্গা তৈরী হয়। নয়া মাঝিমাল্লা নিয়ে বাইন্যা বউ এর পুত্র বাণিজ্য যাত্রা করে। এই বাণিজ্য যাত্রার মঙ্গল কামনায় বাইন্যা বউ

নয়া ডিঙ্গায় তার লক্ষ্মীর ঝাঁপি তুলে দেয়। বাইন্যা বউ এর পুত্র বাণিজ্যের মঙ্গল কামনায় গঙ্গা, মনসা, দক্ষিণরায়, চণ্ডী প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর পূজা করে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"বৈশাখের পরথমে গঙ্গাপূজা মনসাপূজা করে।
কালামানিক দক্ষিণ রায়ের পূজা করে ভক্তি ভরে।।
অক্ষয় তিরতীয়ার দিনে চণ্ডীপূজা করি।
বাণিজ্য যাত্রা করিল পুত্র মায়ের আশীর্বাদ ধরি।।'[৩০৫]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে মানুষ বাণিজ্য যাত্রার মঙ্গল কামনায় গঙ্গা, মনসা, চণ্ডী, দক্ষিণরায় প্রভৃতি লৌকিক দেব-দেবীর পূজা করত। বর্তমান লোকসমাজে আজ ও মানুষ বাণিজ্য যাত্রার সময় উপরোক্ত দেবদেবীর পূজা করে থাকে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে মানুষ কালামাণিককে জলদেবতা এবং দক্ষিণরায়কে বনদেবতা হিসাবে পূজা করে থাকে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সপ্তম খণ্ডের অন্তর্গত 'সন্নমালার পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক দেবী হিসাবে বিষহরি মনসার নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, রাজার পুত্র সন্নমালার প্রেমে উন্মত্ত। এদিকে সন্নমালা মনে প্রাণে সাধুর পুত্রকে স্বামী বলে মেনে নিয়েছে। একথা জানতে পেরে রাজার পুত্র সাধুর পুত্রকে সর্পদংশন করিয়ে মেরে ফেলে। এরপর সাধুর পুত্রকে কলার ভেলায় করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এক জেলের সহায়তায় সন্নমালা সাধুর পুত্রের ভেলার কাছে আসে। এরপর নানা ঘাত প্রতিঘাতের পর এক বৃদ্ধের মন্ত্রবলে সাধুর পুত্র প্রাণ ফিরে পায় ।এরপর সন্নমালা ডৌকা বা ভেলায় করে সাধুর পুত্রকে নিয়ে দেশে ফিরল। এবার রাজপুত্র লৌকিক দেবী মনসার ভয়ে কাঁপতে লাগল। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বলেছেন–

একে একে সগল কথা রাজার কানে গেল
বিষহরি মনসার ভয়ে রাজা কাঁপিতে লাগিল।।'[৩০৬]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে লোকদেবী মা মনসা কে মানুষ সর্পের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পূজা করত। লোকঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান লোকসমাজে আজও মানুষ লোকদেবতা মা মনসাকে সর্পের দেবী হিসাবে পূজা করে।

সপ্তম খণ্ডের অন্তর্গত 'কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ পালা'য় পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী মঙ্গলচণ্ডী, বনদুর্গা, শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা প্রভৃতি লোকদেবীর নাম উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, অপুত্রক দশরথ পুত্র কামনায় জোড় মন্দির ঘরে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করবেন স্থির করলেন। এই সময় এক মুনি এসে দশরথকে একটি অমৃত ফল দিয়ে বললেন, এই ফল খেলে তার তিন স্ত্রী সন্তানবতী হবে। কৌশল্যার পুত্র সন্তান হলে, সেই পুত্রের মঙ্গল কামনায় নানা লৌকিক দেবীর পূজা করা হয়। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"মঙ্গল চণ্ডীরে পূজে গো, দেবী সুবচনী।
বনদুর্গা দেবীরে পূজে গো, ডরায়্যা ডাকিনী।।
শীতলা ষষ্ঠীরে পূজা গো, করে বিধিমতে।
মনসা দেবীরে পূজে গো, নেতার সহিতে।'[৩০৭]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে সন্তানের মঙ্গল কামনায় মানুষ মঙ্গলচণ্ডী, বনদুর্গা, শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা

প্রভৃতি লোকদেবীর পূজা করত। বর্তমান লোকসমাজে আজও মানুষ লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে সন্তানের মঙ্গল কামনায় উপরোক্ত লৌকিক দেবীগণের পূজা করে থাকে।

'কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ' পালায় পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী লোক দেবতা হিসাবে বরুনের নাম উল্লেখ করেছেন। পালায় প্রবেশ করে আমরা জানতে পারি, লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে অপরহণ করে লঙ্কাপুরীতে নিয়ে আসে। সীতার দুঃখে সমুদ্রের দেবতা বরুণ সীতাকে উদ্ধারের জন্য সমুদ্রের উপর দিয়ে পথ করে দিল। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"সাগরের দেবতা বরুণ গো সীতার দুঃখ শুনিয়া।
পথ কইরা দিল বক্ষে গো পাথর বাসাইয়া।।" [৩০৮]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে মানুষ সাগরের দেবতা হিসাবে বরুণ দেবতাকে পূজা করত। বর্তমান লোকসমাজে বরুন দেবতাকে ঝড় বৃষ্টির দেবতা হিসাবে মানুষ পূজা করে।

(ঞ) লোকপ্রবাদ

প্রবাদ শব্দটির উৎপত্তি প্র-√বদ +ঘঞ থেকে - যার অর্থ হল উচ্চারণ করা বা কথা বলা। ভট্টিকাব্যে প্রবাদ শব্দটি গালাগালি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে প্রবাদ শব্দটিকে পরস্পর কথোপকথন, লোকোপবাদ, লোকনিন্দা, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহারের কথা বলেছেন। Pro + verbium শব্দদুটি মিশে লাতিন Proverbium নামক সংযোজক শব্দটি গঠিত হয়েছে। এখানে Pro শব্দটির অর্থ পূর্বে এবং verbium শব্দটির অর্থ শব্দ। অধুনা Proverb শব্দটি দিয়ে অভিজ্ঞতা, উক্তি, তত্ত্ব ইত্যাদি অর্থকে বোঝানো হয়। প্রবাদের সমার্থক শব্দ হল লোকোক্তি। শ্যামদেশে প্রবাদকে 'সূপহাসিত্' (Sup hasit) বলা হত। অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষায় প্রবাদকে 'সুভাষিতম্' বলা হয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে প্রবাদের অস্তিত্ব ছিল। এ প্রসঙ্গে ড. দুলাল চৌধুরী তাঁর 'চাকমা প্রবাদ' গ্রন্থে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন -

"ভারতে প্রবাদ প্রবচনের ঐতীহ্য সুপ্রাচীন, ঋক্‌বেদ ও অন্যান্য বেদ - গ্রন্থে, পঞ্চতন্ত্রে, ধম্মপদে প্রচুর প্রবাদ পাওয়া যায়। মানুষের সামাজিক চেতনা থেকেই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি। প্রাজ্ঞমনস্ক মানুষ তার জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কিত উপলব্ধির সংক্ষিপ্ততম প্রকাশ করেছেন প্রবাদ প্রবচনে। প্রবাদ প্রবচনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় মানুষের আঞ্চলিক পরিবেশ, ঋতু, প্রকৃতি ও সমাজগত পরিচয়। ফলে প্রবাদ-প্রবচন জাতিতত্ব বিচারের শক্তিশালী উপকরণ বলে বিবেচিত। [৩০৯]

লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানের মতো প্রবাদ কোনো একজন মানুষের অভিজ্ঞতার চিহ্নরূপে উক্ত হয়। তবে যতক্ষন না তা বহুজনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই অভিজ্ঞতাকে সত্য বলে সমর্থন করে সর্বজন গ্রাহ্যরূপ পরিগ্রহ না করে, ততক্ষন তা প্রবাদ হয়ে ওঠে না। প্রবাদ একটা জাতির, একটা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে ড. বরুন কুমার চক্রবর্তীর মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য

"প্রবাদ হল মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বাঙ্‌ময় রূপ। আর মানুষের মধ্যে আচার-আচরণে, কর্তব্য এবং জীবনবোধে তথা মানবিক গুণের পরিপ্রেক্ষিতে কতই না বিভিন্নতা, কতই না বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা প্রবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করে বাংলা

প্রবাদের ক্ষেত্রকেও বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করেছে।''[৩১০]

একই ধরণের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে যেকোনো প্রবাদের আভ্যন্তরিন কাঠামো তৈরীর মালমশলা সংগৃহীত হয়। যে কারণে প্রবাদগুলির মাধ্যমে কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং আরো নানান ধরণের মূল্যবোধ প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। তবে প্রায় সমস্ত প্রবাদ সৃষ্টির পিছনে কোনো না কোনো একটি বিশেষ ঘটনা, একটি বিশেষ সংস্কার বা বিশ্বাস, কোনো নির্দিষ্ট একটি লৌকিক অথবা পৌরাণিক কিংবদন্তী অবশ্যই থাকে। কালক্রমে কোনো একটি বিশেষ ঘটনা, অনুরূপ বহুঘটনার উপমাস্থল হয়ে ওঠে বলেই প্রবাদ সর্বজনীন হয়ে উঠে দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করে যায়। লুইস হেনরি মর্গান তার 'এনসেন্ট সোসাইটি' গ্রন্থে প্রবাদ সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবাদের বিশ্বজনীন চরিত্রটির কথা তুলে ধরেছেন। সে কারণে সর্বকালে সর্বদেশে প্রবাদ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানুষ মূলতঃ এক এবং অবিচ্ছেদ্য ঐতিহ্যের অধিকারী। কালক্রমে প্রবাদের উৎসের কাহিনীটি মানুষ বিস্মৃত হলেও পরবর্তী সময়ে উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে, পূর্বে শ্রুত প্রবাদের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য -

> *"প্রবাদ বা প্রবচন জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তি, ইহা এক দিক দিয়া যেমন প্রাচীন, আবার তেমনই অন্যদিক দিয়া আধুনিক - ইহা পূর্ব হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রাচীন, আবার প্রচলিত মনোভাব প্রকাশ করিতেও সহায়তা করিতেছে বলিয়া আধুনিকও''*[৩১১]

প্রবাদ লোকজীবনের দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চয় করা অভিজ্ঞতালব্ধ ফসল। তাই প্রবাদের সত্যতা সম্পর্কে কারুর মনে কোনো দ্বিধা থাকে না। এই সত্য পরীক্ষিত, উপলব্ধিজাত, প্রতিষ্ঠিত সত্য। অধিকাংশ প্রবাদ নিরক্ষর কোনো মানুষের সৃষ্টি। তবে প্রবাদের স্রষ্টা কোনো সমাজ, জাতি, ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষের জন্য প্রবাদ রচনা করেন না। সমাজ জীবনের নানা অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে প্রবাদগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্রষ্টার মুখ থেকে তীর্যক ভঙ্গিকে আশ্রয় করে বেরিয়ে আসে। প্রবাদের সৃষ্টি ও বিবর্তন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে ড. পল্লব সেনগুপ্ত মহাশয় বলেছেন -

"বহু ঘটনার অভিজ্ঞতালব্ধ সার নির্যাস > প্রবাদ > অনুরূপ বহু ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চাবিকাঠি।''[৩১২]

লোকসাহিত্যের মৌখিক ধারা, প্রবাদের মধ্যে একটা প্রাজ্ঞতার ছাপ থেকেই যায়। সরাসরি বলে যা বোঝানো যায় না, ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। যে বিষয়টি বোঝাতে অনেক ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, প্রবাদের ব্যঞ্জনাবহ বুদ্ধিদীপ্ত সংক্ষিপ্ত প্রয়োগে তা তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। আপাত দৃষ্টিতে বহুক্ষেত্রে প্রবাদকে শ্লথ রুচির মনে হলেও এর মধ্যে থাকে একটা সরস বুদ্ধিদীপ্ত বাক-বৈদগ্ধ্য। এ প্রসঙ্গে সুশীল কুমার দে তাঁর গ্রন্থে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন -

> *"প্রবাদের অনেক দিক আছে। কিন্তু প্রবাদ মুখ্যত বাস্তব ঘেঁষা। ইহা পথঘাটের প্রাজ্ঞতা, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। ইহা বহুজনের সুলভ বুদ্ধির উপায় ও ক্ষিপ্র প্রয়োগের অস্ত্র।''* [৩১৩]

প্রবাদের প্রাচীনত্ব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানীরা বলেন, লুইস হেনরি মর্গান কথিত বন্যস্তর অতিক্রম করার মুখে এসে পৌঁছানোর সমকালেই প্রবাদের হদিশ পাওয়া গিয়েছিল। আদিমযুগে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাত্রায় প্রবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মিশরের 'মৃতের পুঁথি', গ্রীসের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' থেকে শুরু করে ভারতের 'ঋক্' ও 'অথর্ব', 'সংহিতা', 'রামায়ণ', 'মহাভারত' 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি প্রাচীন লিখিত সাহিত্যে প্রবাদের বহুল ব্যবহার লক্ষিত হয়। এমনকি বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' এবং আদিমধ্যযুগের নিদর্শন

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' গ্রন্থে প্রবাদের বহুল ব্যবহার আছে। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রবাদের অবিচ্ছিন্ন বিবর্তন কেমনভাবে ঘটে চলেছে ড. দুলাল চৌধুরী এ প্রসঙ্গে তার গ্রন্থে সুন্দর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন -

> *"কতকগুলি বিচ্ছিন্ন জীবন ও সমাজরেণু নিরন্তর ঘুরতে ঘুরতে এক একটি সুস্থিত সমাজে স্বচ্ছ দানা বেঁধে একটি প্রবাদ সৃষ্টি করে। দার্শনিক সত্য ও জীবনের তথ্য এই প্রবাদের অনন্ত বাণীরূপ লাভ করে সর্বজনীন সাহিত্যে পরিণত হয়। পরে এই অনিন্দ্য সাহিত্যের ভাষা চিরায়ত সম্পর্কে পর্যবসিত হয় এবং এর পরিবর্তন সহসা হয় না।"*[৩১৪]

প্রবাদে কোনো আদর্শের কথা থাকে না। একান্ত ঘরের কথা ঘরোয়া ভাবে প্রবাদকে আশ্রয় করে প্রকাশ লাভ করে। আমাদের দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা গ্রাহ্য উপাদানকে আশ্রয় করে প্রবাদ মানব চরিত্রকেই সমালোচনা করে। তাই নানা উপলক্ষ্যে প্রবাদ রচিত হলেও প্রবাদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে মানবচরিত্র। তবে ঘটনার বিষয়বস্তুর উপর প্রবাদের সাফল্য নির্ভর করে না। ব্যঞ্জনাবহ, বুদ্ধিদীপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রয়োগে প্রবাদ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে সুশীল কুমার দে তাঁর 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থের ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন -

> *"প্রবাদের সাফল্য নির্ভর করে না, ইহার বিষয়বস্তুর উপর, নির্ভর করে ইহার সহজ প্রকাশভঙ্গির উপর, ইহার সাধারণ বুদ্ধির সরস চমৎকারিত্বের উপর। ইহার সংক্ষিপ্ত ও সাভিপ্রায় প্রয়োগের সার্থকতার উপর।"*[৩১৫]

গভীরভাবে, পর্যবেক্ষণ করে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা - পর্যালোচনার মাধ্যমে লোকজীবনে দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত অভিজ্ঞতালব্ধ ফসল প্রবাদের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে -

এক।। তীর্যক তুলনা প্রবাদের প্রাণ।

দুই।। ব্যঞ্জনাবহ, সংক্ষিপ্ত, বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগে প্রবাদ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

তিন।। প্রবাদে শব্দের স্বল্পতা ও অর্থের আধিক্য প্রাধান্য পায়।

চার। প্রবাদ অল্পকথায় বহুদর্শীর মতো জীবনকে দেখতে শেখায়।

পাঁচ।। প্রবাদের মধ্যে বহমান জীবনধারার কৃষ্টি ধরা পড়ে।

ছয়। দীর্ঘদিন ধরে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রবাদ আপ্ত বাক্যের মতো সত্য।

সাত।। চুম্বক ধর্মীতার জন্য প্রবাদ দ্রুত গ্রহণযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য হয়ে ওঠে।

আট।। প্রবাদ দীর্ঘদিনের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিজাত সত্যের ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ।

নয়।। প্রবাদে মিশে থাকে রূপক ও অতিশয়োক্তি অলংকারের আকর্ষণীয় কারুকার্য।

দশ।। প্রবাদের মধ্যে থাকে একটি চিরন্তনতা - বিশ্বজনীনতা।

এগারো।। ভাষা, সাহিত্য ও সমাজ জীবনের ইতিহাস জানতে প্রবাদ অপরিহার্য।

বারো।। কোনো জাতির মনস্তত্ব ও নৃতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবাদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রবাদ শুধুমাত্র লোকসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ নয়, বাংলা ভাষার তথ্য সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। মানব সমাজের চলমান জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আজও প্রবাদ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। যুগ ও সময়ের পরিবর্তনে, আর্থসামাজিক পটপরিবর্তনে সমাজ, পরিবেশ, মানুষের রুচিসংস্কৃতি পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে চলেছে। তাই পূর্বের মতো রসঘন ব্যঞ্জনাবহ অভিজ্ঞতালব্ধ প্রবাদ সৃষ্টি না হলেও চলমান জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আজও

প্রবাদ রচিত হয়ে চলেছে। অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করে তুলতে আজও এই বিশ্বায়নের যুগে প্রবাদের ব্যবহার এতটুকুও কমেনি।

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার' সাতটি খণ্ডের বিভিন্ন পালায় কিভাবে প্রবাদের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঞ্জনাবহ প্রয়োগ ঘটেছে নিম্নে তা প্রসঙ্গসহ আলোচনা করা হল -

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডের প্রথম পালা 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালাটিকে সমালোচকগণ আদর্শ গীতিকার মর্যাদা দিয়েছেন। এই পালার নায়ক নদ্যার চাঁদের বাড়িতে হুমরা বেদে তার দলবল নিয়ে খেলা দেখাতে আসে। বেদের দলের সঙ্গে মহুয়াকে দেখে নদ্যার চাঁদ অভিভূত ও পুলকিত হয়ে একটি প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছে -

"গোবর গাদায় পদ্মফুল, কানার পদ্মলোচন নাম।"[৩১৬]

আলোচ্য প্রবাদটি বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'গোবরে পদ্মফুল' এবং 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' হিসাবে বেশ প্রচলিত। মহুয়ার অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনায় আলোচ্য প্রবাদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদ্যার চাঁদের দৃষ্টিতে হুমরা বেদের দলবল আসলে গোবর গাদা, আর মহুয়া সেই গোবর গাদায় ফুটন্ত পদ্মফুল। এইপালার অন্যত্র মহুয়ার সখী পালং সই, নদ্যার চাঁদকে আকাশের চাঁদের সঙ্গে তুলনা করে, মহুয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেছে -

"আশমানেতে হাত বাড়াইছ
কইর‍্যা চাঁদের আশা।"[৩১৭]

আলোচ্য প্রবাদটির মাধ্যমে মহুয়ার সখী পালং সই মহুয়াকে বোঝাতে চেয়েছে যে, আশমানের চাঁদকে যেমন ধরা যায় না, তেমনি নদ্যার চাঁদকে স্বামী হিসাবে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আলোচ্য প্রবাদটি বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো' হিসাবে আজও ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। নদ্যার চাঁদ ও মহুয়াকে বিধাতা যেন একজনকে অন্যজনের পরিপূরক হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। বিধাতার লিখন অনুযায়ী তাদের মিলন যেন অবসম্ভাবী ছিল। পালা রচয়িতা দ্বিজ কানাই তাই বলেছেন -

"বিধাতা মিলাইছে লিখন
না হইব খণ্ডন।"[৩১৮]

আলোচ্য প্রবাদটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে 'বিধাতার লিখন খণ্ডানো যায় না' হিসাবে প্রচলিত আছে।

আবার এই খণ্ডের অন্তর্গত 'সুন্দরী মহুয়া' পালায় দুষমন লুচ্চা কাজি চাঁদবিনোদের স্ত্রী মলুয়াকে নিজের স্ত্রী হিসাবে পেতে চেয়েছে। চাঁদবিনোদকে হেয় প্রতিপন্ন করে লুচ্চা কাজি নেতাই কুটুনিকে বলেছে -

"গোলাপের মধু আজি গাবরিয়ায় খায়।"[৩১৯]

আলোচ্য প্রবাদটি বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'দেবতার ভোগ কুকুরে খায়' হিসাবে প্রচলিত আছে।

আবার 'শ্যাম রায়ের পালা'য় নায়ক শ্যাম রায় একদিন এক ডোম-কন্যাকে জলের ঘাটে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এসময় সেই ডোম কন্যা লজ্জাবনতা হয়ে সসম্ভ্রমে শ্যাম রায়কে বলেছে -

''রাজার ছাওয়াল তুমি রে বন্ধু
আরে বন্ধু তুমি পুর্নুমাসির চান্দ।
আশমান ছাইড়া কেনে রে বন্ধু
জমিনে বাড়াও হাত রে বন্ধু।।"[৩২০]

আলোচ্য প্রবাদ বাক্যটির মাধ্যমে ডোম-কন্যা, রাজপুত্র শ্যাম রায়কে বোঝাতে চেয়েছে যে, তার মতো নিম্নবর্ণের কন্যার সঙ্গে রাজপুত্র শ্যাম রায়ের যেকোনো রকম সম্বন্ধ বা সম্পর্ক অবাস্তব-অকল্পনীয়। আবার এই পালার অন্যত্র ডোম-কন্যা, শ্যামরায়কে বলেছে -

"ঘোলে কি পাইবা বন্ধু দধির আস্বাদ।"[৩২১]

আলোচ্য প্রবাদটি বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না" - হিসাবে প্রচলিত আছে। এই পালার অন্যত্র শ্যামরায় ডোমকন্যাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, শ্যামরায়ের বোন শ্যামরায়কে বলেছে -

"পদ্মফুল হয়্যা কেনরে গাও গাবরের আশা।"[৩২২]

আলোচ্য প্রবাদটি ব্যবহার করে পালা রচয়িতা সমকালীন সমাজব্যবস্থার জলন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন। আলোচ্য প্রবাদটি থেকে আমরা বুঝতে পারি তৎকালীন সমাজে জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা যেমন ছিল, তেমনি অসবর্ণ-বিবাহ সমাজ-স্বীকৃত ছিল না।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের 'কাঞ্চন কন্যা পালা'য় রাজকুমার, ধোপার কন্যা কাঞ্চনমালাকে প্রেম নিবেদন করলে, কাঞ্চনমালা যে জাতিগত বা গোত্রগতভাবে রাজকুমারের সমগোত্রীয় নয়, সেকথা সরাসরি না বলে, বুদ্ধিমতী কন্যার মতো, রাজকুমারকে উদ্দেশ্য করে একটি প্রবাদ উচ্চারণ করেছে -

"আশমানের চান্দ হইয়া রে বন্ধু
কেনে জমিনে বাড়াও হাত।"[৩২৩]

উল্লেখ্য যে আলোচ্য প্রবাদটি আমরা ইতিপূর্বে প্রথম খণ্ডের 'শ্যামরায়ের পালা'য় ডোম কন্যার কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনেছি। কাঞ্চনমালা আলোচ্য প্রবাদটি উচ্চারণ করে রাজকুমারের প্রেমের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে নিজেকে সংযত রেখে প্রায় বিপরীতধর্মী অপর একটি প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছে -

''বাউন হইয়া আমি
কেনে চান্দে বাড়াই হাত।" [৩২৪]

এই প্রবাদবাক্যটি বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো' হিসাবে প্রচলিত আছে। রাজকুমার ধোপার কন্যা কাঞ্চনমালাকে বিয়ে করে রাজরোষে দেশান্তরী হয়ে অন্য এক রাজবাড়িতে ধোপার কাজ করতে থাকে। সেখানকার রাজকন্যা রুক্মিনী কৌশলে সবকিছু অবগত হয়ে রাজকুমারকে বিবাহ করে। ধর্মপিতা তমসা গাজী বাণিজ্যে গিয়ে কাঞ্চনের পিতার সঙ্গে দেখা করে খবর নিয়ে আসে। এসময় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা জন্মাদাতা পিতার কণ্ঠে এই প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহার করেছেন -

"জমিন ছাইড়া পাও বাড়ালে শূন্যে না লয় ভর।
হিয়ার মাংস কাইট্যা দিলেও আপন না হয় পর।"[৩২৫]

এই খণ্ডের 'কমলা রানী' পালায় দেখানো হয়েছে, দেওয়ানের সঙ্গে বিরোধ করে সেই রাজ্যে বসবাস করা যায় না -

"দেওয়ানের সঙ্গে বরুধ কইর‍্যা বাঁচন না যায়।
জলে থাইক্যা কুম্ভীরের সঙ্গে বিরুধ না জুয়ায়।।"[৩২৬]

আলোচ্য প্রবাদ বাক্যটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে 'জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিরোধ করে বাঁচা যায় না' হিসাবে আজও প্রচলিত। এই পালার অন্যত্র পালা রচয়িতা অধরচাঁদ দেখিয়েছেন কালের নিয়মে ধনী দরিদ্র

সকলের জীবনে উত্থান পতন আসে। এ প্রসঙ্গে একটি প্রবাদে এর প্রতিধ্বনি শোনা যায় -

"বাজেয়াপ্ত কইরা লইল সোনার জমিদারী।
কাইল আছিল রাজার হালে আইজ পন্থের ভিখারী।'[৩২৭]

আলোচ্য প্রবাদ বাক্যটি আমরা ব্যবহারিক জীবনে 'আজিকে যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়' হিসাবে প্রবাদাশ্রিত একটি গানের মাধ্যমে প্রায়ই শুনতে পাই। আবার রজনী গোপাল রচিত 'পীর বাতাসী কন্যা' পালায় মানব জীবনের শাশ্বতবাণী প্রবাদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তব পরিবেশের জটিল আবর্তে তিতিবিরক্ত মানুষ এমন কথাই উচ্চারণ করে -

"নগর থাইক্যা বিজন ভালা, আপন থাইক্যা পর।
ঘর থাইক্যা বাহির ভালা আশায় করলে ভর।।'[৩২৮]

আলোচ্য প্রবাদবাক্যটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'আপনের চেয়ে পর ভালো' হিসাবে আজও ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। এই খণ্ডের 'সদাগর কন্যা বগুলা' পালায় বগুলা তার বাল্য সহপাঠী এক সদাগর পুত্রকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু অন্য এক প্রভাবশালী রাজকুমার বগুলাকে জোরপূর্বক বিবাহ করতে চাইলে, বগুলা নানারকম ধর্মীয় ব্রত-অনুষ্ঠানের ছুতা দেখিয়ে বিবাহের কালকে তরান্বিত করবার জন্য রাজকুমারের বিবাহের প্রস্তাবকে এড়িয়ে গিয়ে বলেছে -

"কালপূর্ণ হইতে রে কুমার আর পঞ্চমাস বাকি।
সবুরে ফলিব মেওয়া আশার আশে থাকি।'[৩২৯]

সদাগর কন্যা বগুলার মুখে উচ্চারিত আলোচ্য এই চিরাচরিত লোকপ্রবাদটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'সবুরে মেওয়া ফলে' হিসাবে আজও প্রচলিত হয়ে চলেছে। মনসুর বয়াতি রচিত 'দেওয়ান মদিনা' পালায় মদিনা তার মৃত্যুর আগে দেওয়ান কে বলেছে - তার দুই সন্তান আলাল ও দুলাল যেন সতীনের হাতে অত্যাচারিত না হয়। ,সতীন এলে তার সন্তানদের কি চোখে দেখবে, সে প্রসঙ্গে মদিনা একটি লোকপ্রচলিত প্রবাদ উচ্চারণ করেছে -

"এমন বালাই রে আমি উম দেই বইয়া।
দুগ্ধ দিয়া অজাগর রাখতাম পালিয়া।।'[৩৩০]

আলোচ্য প্রবাদটি আমরা বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা' হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখি। এই খণ্ডের 'আমিনা বিবি ও নছর মালুম' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার শুরুতে ধূয়া হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"ঘরের মধু পরে খায়।'[৩৩১]

আলোচ্য প্রবাদটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে আজও প্রচলিত আছে। এই পালার অজ্ঞাত কবি, প্রধান চরিত্র নছর সম্পর্কে একটি অতিপ্রচলিত প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছেন -

"কাউয়ার বাসাত কোকিলার ছাও ন মানিল পোষ।
ঘরবাড়ি ছাড়িল নছর নছিবের দোষ।।'[৩৩২]

এই পালার অন্যত্র আমিনাকে বিবাহ করে নছর বাণিজ্য যাত্রা করেছে। নছরের অনুপস্থিতির সুযোগে লম্পট এছাক মিঞা আমিনার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা মানুষের স্বভাব প্রসঙ্গে

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"যার সঙ্গে যার মজে মন বাছ বিচার নাই।
কনো জনা সুখ পায় দুধ বেচি মদ খায়।'[৩৩৩]

আলোচ্য প্রবাদটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে প্রচলিত আছে। আবার নছর বাণিজ্য যাত্রায় গিয়ে দীর্ঘদিন পরও ফিরছে না দেখে, আমিনার মা আমিনাকে এছাকের হাতে তুলে দেয়। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত একটি প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করেছেন।

"না বুঝিলা আমিনার মাও কি করিলা কাম।
কাঞ্চা সোনা বেচি আরে পাইলা কাঁচের দাম।।'[৩৩৪]

আমিনা বাল্যকাল থেকে নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। এরপর একে একে বাবা-মা, ভাই-বোনকে হারিয়ে আমিনা অবশেষে ধর্মপিতা গোফুরের কাছে আশ্রয় পায়। এরপর গোফুরের মৃত্যুর পর আশ্রয়হীন আমিনা এক অতিপ্রচলিত প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করেছে -

"যেই গাছ ধরি রে আমি অভাগিনী নারী।
দারুন তুফানে সেই গাছ ফালায় উপাড়ি।।'[৩৩৫]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আলোচ্য প্রবাদটি আমরা আদিমধ্যযুগের একমাত্র নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যের নায়িকা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে অনেক আগেই শুনেছি। এছাড়া তৃতীয় খণ্ডের 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় কঙ্কের সীমাহীন দুঃখকষ্টের বর্ণনা দিতে গিয়ে পালা রচয়িতাগণ আলোচ্য প্রবাদের অনুরূপ প্রবাদ ব্যবহার করেছেন।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পালা 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় পিতা-মাতার মৃত্যুর পর অসহায় কঙ্ক, ঈশ্বরের কৃপায় চণ্ডালের গৃহে প্রতিপালিত হয়। এই বিষয়কে বোঝাতে গিয়ে পালা রচয়িতা অতি নিগূঢ়ভাবে একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"রাখে কৃষ্ণ মারে কে কয় সর্বজন।
সেই তো ঘটনা হইল শুন সভাজন।।'[৩৩৬]

আলোচ্য প্রবাদ বাক্যটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'রাখে হরি মারে কে' হিসাবে প্রচলিত আছে। এই পালার অন্যত্র কঙ্কের জন্মদাতা পিতামাতা এবং পালক পিতামাতার মৃত্যুর পর কঙ্কের সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা দিতে গিয়ে পালা রচয়িতাগণ আরেকটি উল্লেখযোগ্য বাস্তবসম্মত প্রবাদ ব্যবহার করেছেন

"যেই ডালে করে ভর সেই ভাইঙ্গ্যা যায়।
কেমনে বাঁচিব শিশু কি হইব উপায়।।'[৩৩৭]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আদিমধ্যযুগের একমাত্র নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের নায়িকা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে আমরা এমন প্রবাদোক্তি অনেক আগেই শুনেছি। এছাড়া 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের 'আমিনা বিবি ও নছর মালুম' পালায় আমরা আমিনার কণ্ঠে প্রায় সমধর্মী অনুরূপ প্রবাদবাক্য উচ্চারিত হতে শুনতে পাই। 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় আমরা শুনতে পাই কঙ্কের বাঁশির সুর শুনে লীলা উন্মনা হয়ে পড়ে। কঙ্কের প্রতি অন্তরের প্রবল টান অনুভব করে লীলা। মনের কথা প্রকাশ করতে না পেরে লীলা একটি প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করেছে -

"বামন হয়্যা চান্দের আশা
করে লোকে উপহাস।

মনের কথা মনে থাকব
না হইব পরকাশ।।'[৩৩৮]

আলোচ্য প্রবাদবাক্যটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাওয়া' হিসাবে প্রচলিত আছে। কঙ্কের ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন, কবিত্বশক্তি, বাঁশি বাজানোর ক্ষমতা প্রসঙ্গে পালা রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম দামোদর দাস কঙ্কের অসামান্য প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"দামোদর দাসে কয় এ ছেলে সামান্য নয়
গোবরে ফুইট্যাছে পদ্মফুল।'[৩৩৯]

আলোচ্য প্রবাদটি বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'গোবরে পদ্মফুল' হিসাবে প্রচলিত আছে। উল্লেখ্য যে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডে 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালার নায়ক নদ্যার চাঁদের কণ্ঠে আমরা এই প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হতে শুনতে পাই। আবার কঙ্ককে দেখে কঙ্কের ভক্তি, শ্রদ্ধা, ধর্মে মতি ইত্যাদি জ্ঞাত হয়ে পীর, কঙ্কের প্রতিভাকে সম্মান জানিয়ে এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে সম্মান জানিয়ে একটি প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছেন, যেটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে -

"জুহরি জহর চিনে বানিয়ায় চিনে সোনা।
পীর প্যাগম্বরে চিনে সাধু কোন জনা।।'[৩৪০]

এদিকে কঙ্ক পীরের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে ভক্তিপূর্ণ মনে পীরের প্রসাদ খাওয়ার ফলে জনমানসে তার জাতিকূল নষ্ট হয়। সকল প্রতিবেশীরা কঙ্ককে নাশ করতে চাইল। সকলে মিলে রটিয়ে দিল যে, লীলা তার জীবন যৌবন কঙ্কের নিকটে সঁপে দিয়েছে। এসমস্ত দেখে শুনে গর্গ রাগে উন্মত্ত হয়ে একটি প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেন -

"দুগ্ধ দিয়া কালসাপে কইর‍্যাছি পালন।
ফাঁক প্যায়া সেই সাপে কইর‍্যাছে দংশন।'[৩৪১]

আলোচ্য প্রবাদ বাক্যটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে ''দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা'' হিসাবে প্রচলিত আছে। কঙ্ক সম্পর্কে আলোচ্য প্রবাদ বাক্য উচ্চারণের পর, গর্গ তার কন্যা লীলা সম্পর্কেও একটি লোক প্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"কলসী থইয়্যা তুমি যাও ফিইরা ঘরে।
দেবের নৈবেদ্য মোর খাইয়্যাছে কুকুরে।।'[৩৪২]

এরপর দৈববাণীর সাহায্যে গর্গ যখন জানতে পারলেন লীলা ও কঙ্ক সম্পূর্ণ নির্দোষ তখন অনুশোচনায় দগ্ধ গর্গ বলেন -

"শাস্ত্রজ্ঞান পণ্ড হইল গেল ইহ পরকাল।
আপনার পায়ে আমি মারিলাম কুড়াল।।'[৩৪৩]

আলোচ্য লোক প্রবাদটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা' হিসাবে প্রচলিত আছে।

এই খণ্ডের অন্তর্গত 'ভেলুয়া সুন্দরী–আমীর সাধু' পালায় সাত ভাইয়ের একমাত্র বোন ভেলুয়া সুন্দরীর হাউসের কৈতর মারার কারণে ভেলুয়ার সাত ভাইয়ের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা বাস্তবজীবনে ব্যবহারযোগ্য

একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"সাত ভাই শুনিয়ারে জ্বলিয়া উঠিল।
বারুদের ঘরে যেমন আগুন লাগাই দিল।।'[৩৪৪]

এই পালার অন্যত্র আমির সাধু বাণিজ্য যাত্রার পর ভেলুয়ার অদর্শনে অত্যন্ত মনোকষ্ট পান। সেকারণে বাণিজ্য যাত্রা শুরু করে চারদিন পর তিনি পুনরায় নিজের বাড়ির কাছে শাফলা বন্দরে এসে উপস্থিত হন। ভেলুয়াকে দর্শণ করার পর আমির সাধুর মনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছেন -

"ভেলুয়ারে দেখি আমির হইল পাগল।
কুলর মাছ পাইল যেন পানির লাগল।।'[৩৪৫]

এরপর আমির সাধু পুনরায় বাণিজ্যযাত্রা করে এবং বহু ধনসম্পত্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে জানতে পারল ভেলুয়া সুন্দরীকে তিনদিন আগে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। একথা শোনার পর আমির সাধুর যে অবস্থা তা বর্ণনা করতে গিয়ে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা আমাদের বাস্তব জীবনে অতিপ্রচলিত একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"এই কথা শুনি সাধু করে ধড়ফড়।
আশমান ভাঙ্গি পইড়ল যেন মাথার উপর।।'[৩৪৬]

ভেলুয়াকে না খুঁজে পেয়ে আমির সাধু সংসার ত্যাগ করে ফকির বেশে ভেলুয়ার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। অনেক খোঁজ খবর নিয়ে আমির সাধু জানতে পারে যে, ভোলা নামে এক চোর ভেলুয়াকে আটকে রেখেছে। এরপর আমির সাধু মুনাপ কাজির কাছে বিচার চাইল। মুনাপ কাজী ভোলাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিল কিন্তু ভেলুয়া সুন্দরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমির সাধুকে বলল -

"তোমার যোগ্য নয় এ বিবি তোমার যোগ্য নয়।
কুত্তার পেডে ঘিওর ভাত বদ্‌হজম হয়।।'[৩৪৭]

আলোচ্য প্রবাদ বাক্যটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় - 'কুত্তার পেটে ঘি-ভাত সহ্য হয় না" রূপে বহুলভাবে প্রচলিত আছে।

এই খণ্ডের 'কমলা কন্যার পালা'য় কমলার রূপে মুগ্ধ হয়ে কমলাকে পাওয়ার আশায় কারকুন দূতী হিসাবে চিকন গোয়ালিনীকে নিয়োগ করে। গোয়ালিনী যখন কিছুতেই রাজী হচ্ছে না তখন কারকুন তার হাতে একশো টাকা গুঁজে দেয়। এসময় গোয়ালিনীর মনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে পালা রচয়িতা একটি অতিপ্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"ট্যাকা পাইয়া গোয়ালিনী আনন্দিত মন।
ট্যাকায় যে বশ এই না তিরভূবন।।'[৩৪৮]

এরপর গোয়ালিনী কারকুনের কথা কমলাকে বললে কমলা গোয়ালিনীকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলে। কারকুন প্রসঙ্গে কমলা কন্যা আমাদের বাস্তবজীবনে ব্যবহৃত একটি প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেন -

"পায়ের চাকর হইয়্যা শিরে উঠিতে চায়।
বেঙ্গে কবে শুইন্যাছিস পদ্মের মধু খায়।'[৩৪৯]

আবার এই একই প্রসঙ্গে বিপথে নিয়ে যেতে চাওয়ার অপরাধে চিকন গোয়ালিনীকে কমলা যে শাস্তি দানের

কথা বলেছে তা আসলে আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে অতিপ্রচলিত একটি প্রবাদ -

"ইচ্ছা যদি করি তারে দিতে পারি শূলে।
কুকুরে কামড়ায় কেবা কুকুরে কামড় দিলে।।"[৩৫০]

টাকার লোভে চিকন গোয়ালিনী কারকুনের লেখা পত্র নিয়ে কমলাকে দিলে ক্রুদ্ধ কমলা গোয়ালিনীকে কিল, চড়, লাথি মেরে উচিৎ শিক্ষা দিয়েছে। গোয়ালিনীর মতো নীচ চরিত্রের মহিলাকে শূলে না দিয়ে কমলা আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে অতি প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করেছে -

"মাছি মাইর‍্যা কেন করবাম দুই হাত কালা।
কারকুনের কইছ গিয়া তোর আগছালা।।"[৩৫১]

কমলা কন্যা আপন বুদ্ধিমত্তায় দয়াল রাজার রাজসভায় কারকুনের সমস্ত অভিসন্ধি ফাঁস করে দিল। দয়াল রাজা তখন জানতে পারল কমলার দুঃখের জন্য দায়ী কে? কেনই বা কমলার ভাই ও বাবা আজ বন্দী। এসময় কারকুন প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান একটি বাস্তব সম্মত প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেন -

"কাডা ভাইঙ্গা ঠাডা পড়ে কারকুনের শিরে।
কইতে না পারে কথা ধর্মরাজার ডরে।।"[৩৫২]

এই খণ্ডের 'সুনাই সুন্দরী' পালায় মামার বাড়িতে গিয়ে সুনাই সুন্দরীর সঙ্গে এক চাষীর ঘরের মেয়ের বন্ধুত্ব হয়। সেই সখী যখন সুনাই সুন্দরীকে বিয়ে প্রসঙ্গে কথা বলে, তখন সুনাই সুন্দরী একটি বর্তমানে অতিপ্রচলিত প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেন -

"কপালের লিখন সইলো
লিখন খণ্ডন না যায়।।"[৩৫৩]

আলোচ্য প্রবাদটি বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'কপালের লিখন খণ্ডানো যায় না' হিসাবে প্রচলিত আছে।

'সুনাই সুন্দরী পালা'য় মামার বাড়িতে গিয়ে সুনাই তার সখীর সঙ্গে বকুলগাছের তলায় বসে মালা গাঁথে আর তার বিবাহের কথা ভাবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে সুনাই এর বিবাহের জন্য পাত্র আসে, কিন্তু সুনাইও তার মায়ের পছন্দ হয় না। এরপর একদিন মামারবাড়ি দীঘলহাটি গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার পুত্র মাধবকে তীর ধনুক হাতে শিকার রত অবস্থায় দেখতে পেল। এরপর মাধবও সুনাই এর চারচক্ষুর মিলন ঘটল। দুজন দুজনের কথা বিহ্বল হয়ে ভাবছে। এই প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা একটি লোক প্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"ইকরের কড়মড় মাকড়ের না আশ।"[৩৫৪]

ইকর বা ইকড় একপ্রকার ঘনভাবে উৎপন্ন গুল্ম বিশেষ। ইকড় বনে চলতে গেলে যেমন মড়মড়ে শব্দ হয় এবং মুখে মাকড়শার জাল জড়িয়ে যায়, তেমনি গোপন প্রেম প্রকাশ হয়ে পড়লে নানারকম অসুবিধা ঘটায়।

'ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী' পালায় ভারইয়া রানী তার কন্যা চম্পাবতীর সঙ্গে, সিঙ্গি রাজপুত্র দুধরাজের বিবাহের প্রস্তাব দিলে, সিঙ্গি রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বর্তমান বাস্তব জীবনে প্রচলিত প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করেন -

"কোচের সঙ্গে কিসের সম্বন্ধ কিসের বিহালী।
আশমান জমিনে কবে হয় যে মিতালি।।
দেবতার বংশ আমি উচ্চকুলের কুলী।
সিংহের সঙ্গে হয় কি শিরগালের মিতালি।।"[৩৫৫]

'শীলাদেবীর পালা'য় মুণ্ডার নেতৃত্বে ডাকাতদল বামুন রাজার রাজ্য আক্রমণ করলে বামুন রাজা, রাজকন্যা শীলা ও রানীকে নিয়ে রাজবাড়ির পিছন দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে পরগণার রাজার কাছে আশ্রয় নিল। এই আক্রমণ প্রসঙ্গে পরগণার রাজার কাছে বামন রাজা যে কথা বলেছে তা আসলে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অতি প্রচলিত একটি প্রবাদ -

"দৈবে তো রাজত্বি নিল ঝুলি দিল হাতে।
বিনা মেঘে ঠাডা বজ্জর পড়িল মোর মাথে।।'[৩৫৬]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পালায় 'রঙ্গমালা সুন্দরী ও চৌধুরীর লড়াই' পালায় রামগতি টাকা পয়সার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে রঙ্গমালা সুন্দরীকে বলেছে -

"ট্যাকা হইলে বাঘের চৌগ বাজারে কিনন্ যায়।'[৩৫৭]

আলোচ্য লোকপ্রবাদটি বর্তমান সমাজজীবনে 'টাকা থাকলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়' বা 'টাকা থাকলে বাঘের চোখ পাওয়া যায়' হিসাবে প্রচলিত আছে। এই পালার অন্যত্র রাজচন্দর ও রঙ্গমালা সুন্দরীর প্রেমের কথা সকলকে জানানোর পর অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালার ধূয়া অংশে একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"পিরিতি করিবি পরানে মরিবি।'[৩৫৮]

পালার শুরুতে রাজচন্দর রঙ্গমালা সুন্দরীকে দেখে রঙ্গমালা সম্বন্ধে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে, তা আসলে আমাদের লোকজীবনে প্রচলিত একটি প্রবাদ -

"আলগে থাকি রাজচন্দর নজর করি চায়।
আশমানর চাঁদ জমিনে লাইম্ছে এমন দেখা যায়।'[৩৫৯]

আবার রঙ্গমালা সুন্দরীর খবর এনে দেওয়ার জন্য রাজচন্দর, শ্যামপ্রিয়াকে টাকা, জমি এমনকি রাজগঞ্জের হাট তার নামে লিখে দেওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে শ্যামপ্রিয়া যে কথা বলেছে, তা আসলে আমাদের সমাজজীবন যাত্রায় বহু প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য বিশেষ -

"বাকির নামে ফাঁকি দাদা সর্ব্বলোকে কয়।
সারিলে আপন কায্য ফিরি নাহিত চায়।'[৩৬০]

এরপর রাজচন্দ্র, রঙ্গমালার বাড়ির দরজায় এলে রঙ্গমালার মানসিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা ধূয়া অংশে লোকজীবন যাত্রায় অতিপ্রচলিত একটি প্রবাদ ব্যবহার করেন -

"চাতক পাইল আজি পিয়াসের পানি।'[৩৬১]

নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে রাজচন্দর ও রঙ্গমালার প্রেম কাহিনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা প্রেম প্রসঙ্গে সর্বজন বিদিত একটি প্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"সখী পিরিতি বিষম জ্বালা, পিরিতি পিরিতি সবাই করে
জানেনা পিরিতি কান্টার মালা।।'[৩৬২]

এখানে উল্লেখ্য যে লোকজীবনযাত্রায় প্রচলিত আলোচ্য প্রবাদটি আমরা অনেক আগেই আদিমধ্যযুগের একমাত্র নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের নায়িকা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে শুনতে পাই। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমের ক্ষেত্রে যে নানা প্রতিকূলতা, সে প্রসঙ্গে রাধা তার সখীদের এমন কথাই বলেছিলেন। এরপর রঙ্গমালা সুন্দরীর লেখা একটি চিঠি

নিয়ে শ্যামপ্রিয়া, রামভাড়ালীর কাছে গিয়ে বলল - এই চিঠিটি রাজচন্দরের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে পাঁচ টাকা পাবে। একথা শুনে রামভাড়ালী রাজী হয়ে বলে -

"ট্যাকার অসাধ্য কাম তিরজগতে নাই।।'[৩৬৩]

আলোচ্য প্রবাদটি বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'টাকায় কিনা হয়' হিসাবে প্রচলিত আছে। পালার অন্যত্র ইঙ্গা চৌধুরী ও চাঁদ ভাঁড়ালীর মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলে বাঞ্ছারাম, ইঙ্গা চৌধুরীদের দরবারে কাজ করা সত্ত্বেও চাঁদ ভাঁড়ালীকে যুদ্ধে সাহায্য করেছে। রামধনা এই খবর ইঙ্গা চৌধুরীকে জানিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা, রচয়িতা রামধনার কণ্ঠে একটি অতিপ্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"যার নুন খাই আমি তার গুণ গাই।।'[৩৬৪]

আলোচ্য প্রবাদটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'নুন খাই যার গুন গাই তার' হিসাবে প্রচলিত আছে।

এই খণ্ডের 'মানিকতারা ডাকাইত পালা'য় বাসু নাপিত মাইন্দা গ্রামে সাধু শীলের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তার কন্যা মানিকতারাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে, সাধুশীল তাকে পরম অতিথি হিসাবে গণ্য করে তার জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু বাড়ির বড়ো বউ, ছোটো বউ, রান্না শেষ করতে পারছে না দেখে বাসুর ভাবি শাশুড়ি অত্যন্ত রেগে যায়। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা শেখ আমির উদ্দিন বাসুর ভাবী শাশুড়ীর আচরণের বিবরণ দিতে গিয়ে একটি অতিপ্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"হাউড়ি দিল মরিচ বাইট্যা গালির উপর তালি।।'[৩৬৫]

আলোচ্য লোক প্রবাদটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে একটু অন্যভাবে, 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা' হিসাবে প্রচলিত আছে। আবার রাজচন্দর নর বাড়িতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পাঠালে পত্র পড়ে রাজিন্দর খুড়ো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে প্রচলিত একটি লোকপ্রবাদ ব্যবহার করেছেন-

"পত্তর পড়ি রাজিন্দর খুড়া মাথাত দিল হাত।
ঠাডার ভঙ্গি পইড়ল যেমন সামনে অকরস্মাৎ।।'[৩৬৬]

'মইষাল বন্ধু সাঁজুতি কন্যা পালা'য় সুজন ঋণ করে শোধ না দিয়ে মারা যাওয়ার পর, তার পুত্র ডিঙ্গাধরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা আমাদের ,সমাজজীবনের অতিপ্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছেন -

"বল্লার কামড়ে যেমুন মানুষ হয় ফানা।
সকল দুঃখের অধিক দুঃখ যার আছে দেনা।।'[৩৬৭]

আবার এই পালার অন্যত্র ডিঙ্গাধরের বাঁশির আওয়াজ শুনে সাঁজুতি কন্যার মন উচাটন হয়ে ওঠে। সাঁজুতি কন্যার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা একটি প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করেছেন -

"আষ্ট আঙ্গুল বাশের বাঁশি তার মধ্যে মধ্যে ছেঁদা।
যেই না বাঁশি শুইন্যা হইলা কলঙ্কিনী রাধা।।'[৩৬৮]

আলোচ্য লোক প্রবাদটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আজও প্রচলিত আছে। উল্লেখ্য যে, আদিমধ্যযুগের একমাত্র নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কলঙ্কিনী রাধার প্রসঙ্গ আমরা অনেক আগেই শুনেছি।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার' পঞ্চম খণ্ডের 'কমল সদাইগর পালা'য় কমল সদাইগরের স্ত্রী তিনদিনের জ্বরে মারা গেলে, কমল সদাইগরের স্ত্রী সুরঙ্গিনীর মৃত্যু প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা একটি লোকপ্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করেছেন-

''আরে কিবা ছোড় কিবা বড়ো
যমে কি আর মানে।
আয়ু শেষ হইলে ভাইরে
তারে রশি ধইরা টানে।।''[৩৬৯]

স্ত্রী সুরঙ্গিনীর মৃত্যুর পর কমল সদাইগর দুঃখ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে আক্ষেপ করে যে কথা বলেছে তা আসলে একটি লোক প্রচলিত প্রবাদ -

"সুখর কালে দুঃখ আসি করি দেয় নৈরাশ।
রঙের বাত্তি নিপাই দিল আসি কাল বাতাস।।'[৩৭০]

সুরঙ্গিনীর মৃত্যুর পর কমল সদাইগর শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা একটি বাস্তবসম্মত প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছেন -

"কপাল যহন ভাঙে তহন
ডাঙ্গায় কুমইরে খায়।
ভরা গাঙ্গে চর পইড়া
সাধুর নাও তলায়।।'[৩৭১]

আবার সুখ-দুঃখের সময় মানুষের অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে এই পালার অজ্ঞাত কবি বর্তমানে ব্যবহারযোগ্য আরেকটি প্রবাদের উল্লেখ করেছেন -

"সুখর সময় সগলেই
সুখর সাক্ষাৎ হয়।
দুঃখর সময় জাইন্য ভাইরে
কেউ কারও নয়।।'[৩৭২]

আবার এই পালার অন্যত্র সুরঙ্গিনীর মৃত্যুর পর কমল সদাইগর নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লে পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে বলে। কিন্তু কমল সদাইগর তাতে রাজি হয়নি। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"মানুষের মনরে জাইন্য কচুপাতায় জল।
লড়াচড়া খাইলে ভাইরে করে টলমল।।'[৩৭৩]

'আন্ধাবন্ধুর পালা'য় আন্ধা বন্ধুর বাঁশির শব্দ শুনে রাজকন্যার মন উচাটন হয়ে ওঠে। রাজকন্যার মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন যা বর্তমান সমাজে আজও প্রচলিত -

"তোষের আগুন যেমুন রে
ঘুইয্যা ঘুইয্যা জ্বলে।

কাঞ্চা না বাঁশেতে বন্ধু
আইজ ধইরা গেছে ঘুন।।'[৩৭৪]

আবার এই পালার অন্যত্র রাজকন্যা আন্ধা বন্ধুকে হারাতে চায় না। কিন্তু আন্ধা বন্ধু নিজের দুঃখময় জীবনকে রাজকন্যার সঙ্গে জড়াতে চায় না। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা আমাদের বর্তমান সমাজজীবনে প্রচলিত একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

''পিরীত মধু পিরীত মধু
ফল শুনিতে চমৎকার।
মাকাল যেমুন বাইরে লালিম
ভিতরেতে অঙ্গার।।'[৩৭৫]

প্রভাতকালে আন্ধাবন্ধুর বাঁশির সুর শুনে রাজা তাকে রাজদরবারে আনতে বললেন। প্রহরী আন্ধাবন্ধুকে রাজসভায় নিয়ে এলে রাজা তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে আন্ধাবন্ধু একটি প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছে -

"কোকিলায় দিয়েছে জনম
মোরে কাকে তো পুষিল।
শিশুকালে নিদয়া কাকে
মোর চক্ষু কাইড়্যা নিল।।'[৩৭৬]

আলোচ্য লোকপ্রবাদটি আমাদের বর্তমান সমাজ জীবনে একটু অন্যভাবে ''কাকের বাসায় কোকিলের ছা' হিসাবে আজও প্রচলিত আছে।

এই খণ্ডের 'পরীবানু বেগম' এর পালায় সিংহাসনের জন্য সুজা বাদশার ভাই শত্রু হয়ে উঠল। যুদ্ধে ভাইয়ের কাছে পরাজিত হয়ে সুজা বাদশা তার আওরত পরীবানুকে নিয়ে প্রথমে রাজ্যত্যাগ করে চাডিগাঁ এলেন এবং পরে চাডিগাঁ ও ত্যাগ করলেন। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা একটি অতিপ্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"নসীবের লেখা হায় দুন কভু না যায় খণ্ডন।
চাডিগাঁ ছাড়িতে বাদশা করিল মনন্।।'[৩৭৭]

আলোচ্য প্রবাদটি আমাদের বর্তমান সমাজে একটু অন্যভাবে 'কপালের লিখন খণ্ডান যায় না' হিসাবে প্রচলিত আছে।

এই খণ্ডের 'ছুরত জামাল - অধুয়া সুন্দরী' পালায় বানিয়াচঙ্গ মুলুকে আলাল ও দুলাল নামে দুইভাই রাজত্ব করত। বড়ভাই আলালের স্ত্রী, সন্তান সম্ভবা হলে ছোটভাই দুলাল গণকের সঙ্গে কুপরামর্শ করে প্রথমে আলালের স্ত্রীকে হাইল্যা বনে পাঠায় এবং পরে পুত্রসহ আলালের স্ত্রীকে প্রাণে মেরে রাজসিংহাসন পেতে চাইল। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা ফৈজু ফকির একটি লোকপ্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"আল্লায় যদি রাখে বান্দারে।
দুশমন কি করিবার পারে।।'[৩৭৮]

আলোচ্য লোকপ্রবাদটি আমাদের বর্তমান সমাজজীবনে একটু অন্যভাবে ''রাখে হরি মারে কে" হিসাবে প্রচলিত আছে। 'কবরের কান্না' পালায় নুরুন্নেছার জন্মবৃত্তান্ত জানার আগে মালেক ও নুরুন্নেছার প্রেম সম্পর্কে

অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোক সাধারণের মধ্যে অতি প্রচলিত একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"আরে ছোড কাইল্যা পিরীত রে ভাই
যেমুন কাঁট্টলের আঠা।।'[৩৭৯]

আবার এই পালার অন্যত্র মালেক নুরুন্নেছাকে বিবাহ করবে বলে মনস্থির করার পর জানতে পারল যে, নুরুন্নেছা সম্পর্কে তার বোন। একথা জানার পর মালেকের মানসিক অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে অজ্ঞাত কবি আমাদের সমাজজীবনে প্রচলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"বসিয়া পড়িল মালেক এই কথা শুনিয়া।
আশমান ভাঙ্গি পইড়্‌ল যেন কাঁপিল দুনিয়া।।'[৩৮০]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ষষ্ঠ খণ্ডের 'কুমার বীরনারায়ণ পালা'য় দুর্জন সাধুর ডিঙা থেকে সোনামনিকে উদ্ধার করে গ্রামে ফিরলে বীরনারায়ণ ও সোনামনি দুজনের নামে কলঙ্ক রটে গেল। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা সোনামনির কণ্ঠে একটি চিরাচরিত প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"পুরুষের কলঙ্ক যেমুন চৈত্তরের মেঘলা রাতি।
নারীর কলঙ্ক কুমার হয় জীবনের সাথী।।'[৩৮১]

কুমার বীরনারায়ণ সাধারণ গৃহস্থ ঘরের কন্যা সোনামনির রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রশংসা করলে, সোনামনি বীরনারায়ণের উদ্দেশ্যে বর্তমান সমাজে প্রচলিত একটি বাস্তবসম্মত প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছে -

"আপনে হইছুইন জমিদার, মুই গিরস্তের নারী।
মোর লগে আগনের পিরীত পউদ্মের পাতায় পানি।।'[৩৮২]

এরপর কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বীরনারায়ণ সোনাকন্যাকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। সেখানে মেওয়া ফল খেয়ে তারা সুখে দিন কাটাতে থাকে। বীরনারায়ণ ও সোনামনির এই অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"উনাভাতে দুনা বল হইছে তারার গাও।
বাঘ ভাল্লুকের লগে তারার হইছে বনে বাও।।[৩৮৩]

সোনাকন্যার সঙ্গে বীরনারায়ণের বিবাহ জমিদার মেনে নেয়নি। বীরনারায়ণ সোনাকন্যাকে নিয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেও জমিদারের লোকজন তন্নতন্ন করে খুঁজে জোরপূর্বক বীরনারায়ণকে ধরে আনে। এসময় গভীর জঙ্গলে সোনাকন্যার নিঃসঙ্গ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা একটি লোক প্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"এমুন সুখের বনে হায়রে কি কাম হইল।
বিনা মেঘে ঠাডার আইসা মস্তকে পড়িল।।[৩৮৪]

আলোচ্য প্রবাদটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত' হিসাবে প্রচলিত আছে। 'ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধু' পালায় মানিক সদাগর তার একমাত্র কন্যা ভেলুয়ার বিবাহের জন্য পাত্র দেখছে। এই প্রসঙ্গে মানিক সদাগর লোকজীবনে প্রচলিত একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছে -

'চান্দ হেন কইন্যা আমার চাই সূরজ হেন পতি।
জুনাকির সঙ্গে না হয় চান্দের পিরীতি।।'[৩৮৫]

মদন সাধু বাণিজ্যে গিয়ে মানিক সদাগরের একমাত্র কন্যা ভেলুয়া সুন্দরীকে বিবাহ করে নিয়ে এলে পিতা মুরাই সাধু তা মেনে নেয়নি। এদিকে নাপিতের কাছে ভেলুয়ার চুল ও রূপের বর্ণনা শুনে রাংচাপুরের আবু রাজা ভেলুয়া সুন্দরীকে বিবাহ করতে চায়। এসময় মদন, ভেলুয়া সুন্দরীকে যেকথা বলেছিল, তা আসেল একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকপ্রবাদ -

"শুন শুন পরানের ভেলুয়া কইয়া বুঝাই তরে।
আশমান ভাইঙ্গ্যা পইড়্যাছে আমার মাথার উপরে।।'[৩৮৬]

আলোচ্য প্রবাদটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া' হিসাবে প্রচলিত আছে। মদন সাধুর কাছ থেকে ভেলুয়া সুন্দরী জানতে পারল ডাকাত আবু রাজা তাকে বিবাহ করতে চায়। এসময় ভেলুয়ার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে পালা রচয়িতা একটি অতি প্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"এইনা কথা শুইন্যা ভেলুয়ার মাথায় পড়ে ঠাডা।
কাঁইপ্যা উঠিল বইক্ষ লোমে দিল কাঁটা।।'[৩৮৭]

পালার অন্যত্র ভেলুয়া সুন্দরী যখন মদনকে চোখে হারায় অবস্থা তখন মদনের বন্ধু হিরণ ভেলুয়াকে বিবাহ করতে চায়। এইসময় ভেলুয়া তার আপন অন্তরের দুঃখ বর্ণনা করতে গিয়ে একটি বাস্তবজীবনে ব্যবহার যোগ্য প্রবাদ উচ্চারণ করেছে -

"যেই না ডালে ভর করি রে
আমার ভাঙ্গে সেই ডাল।
রূপ হইল বৈরী রে আমার
যইবন হইল কাল।।'[৩৮৮]

ভেলুয়া সুন্দরী হিরণ সাধুর বাড়ি আশ্রয় নিলে হিরণ সাধু ভেলুয়াকে বিবাহ করতে চাইল। বুদ্ধিমতি ভেলুয়া বিবাহের জন্য তিনমাস সময় নিল। এদিকে হিরণ সাধু বন্ধু মদনকে হত্যা করে ভেলুয়াকে পেতে চেয়ে বাণিজ্য যাত্রা করল এবং ভেলুয়াকে বলল মদনকে সে খুঁজে আনবেই। হিরণ সাধুর স্বভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা একটি প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করেছেন -

"মনে বিষ মুখে মধু এতেক কইয়া।
ভেলুয়ার কাছে গেল বিদায় লইয়া।।'[৩৮৯]

আলোচ্য প্রবাদটি আমাদের বর্তমান লোকজীবন যাত্রায় 'মুখে মধু অন্তরে বিষ' হিসাবে প্রায়শই উচ্চারিত হতে শোনা যায়।

এই পালার অন্যত্র এক ধার্মিক সাধু ভেলুয়া ও মেনকাকে অচৈতন্য অবস্থায় নদীর চড়া থেকে তুলে এনে সুস্থ করে তোলে। এরপর তাদেরকে তাদের পিতামাতার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ধার্মিক সাধু বাণিজ্য যাত্রা করেন। কিন্তু পথে ডাকাত আবু রাজা, দুইকন্যাসহ সাধুর সমস্ত ধন সম্পত্তি লুট করে নিয়ে সাধুকে মারতে চেষ্টা করে। অতি কষ্টে প্রাণ ফিরে পেয়ে মদন সাধুর দেখা পেয়ে ধার্মিক সাধু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে একটি চিরাচরিত প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করেন -

"ভালা কইরতে মন্দ হইল বিধির নির্বন্ধে।
ধর্মপথে যাইতে শেষে পইড়া গেলাম ফান্দে।।'[৩৯০]

আলোচ্য প্রবাদটি আমাদের সমাজজীবন যাত্রায়। 'পুন্য কর্মে বিপদ বেশি।' হিসাবে প্রচলিত আছে।

এই খণ্ডের 'বাইন্যা বউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি' পালায় সওদাগর বাইন্যা বউকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে, অভাব থাকলে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে সওদাগর বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে অতিপ্রচলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ উচ্চারণ করেছেন -

''অভাবে স্বভাব নষ্ট
সর্ব্বলোকে কয়।
অভাবে পইড়্যা মাইন্‌ষে
চুরি কইর‍্যা খায়।।'[৩৯১]

'মলয়া কন্যার পালা'য় হাইর‍্যা নামে এক ডাকাত একদিন ডাকাতি করতে গিয়ে মলয়া কন্যাকে চুরি করে নিয়ে আসে। কিন্তু মলয়া কন্যা সবসময় তার জন্মদাতা মা-বাবার কথা মনে করত। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা আমাদের লোক জীবনযাত্রায় অতিপ্রচলিত একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"দশ বচ্ছরের কইন্যা
কেরমে যুলো বচ্ছরের হইল।
কাউয়ার বাসায় কোকিলের ছা
কইন্যা পোষ না মানিল।।'[৩৯২]

আলোচ্য প্রবাদটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ''কাকের বাসায় কোকিলের ছা'' হিসাবে প্রায়শই উচ্চারিত হতে শোনা যায়।

এই খণ্ডের 'হাতি খেদার গান' পালায় হাতি ধরতে ওস্তাদ জমাদার গোলবদনের সঙ্গে শত শত মানুষ গ্রাম ছেড়ে হাতি ধরার কাজে যোগ দিয়েছে। কিন্তু হাতি ধরার কাজে নিযুক্ত কর্মীরা তিতিবিরক্ত হয়ে যে কথা উচ্চারণ করেছে তা আসলে বাস্তবে বহু প্রচলিত একটি প্রবাদ প্রবচন -

"গাছত কাঁট্টল দেহি আরে ঠোডত্ দিলম্ ত্যাল্
ওরে ঠোডত্ দিলম্ ত্যাল্।।'[৩৯৩]

আলোচ্য প্রবাদটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল' হিসাবে বহু প্রচলিত।

এই খণ্ডের 'মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পালায় কৃষ্ণ মাঝির বেশ ধরে মথুরার ঘাটে খেয়া পারাপার করছে। রাধাসহ নয় গোয়ালিনী যমুনা নদী পার হয়ে মথুরায় দধি বিক্রয় করতে যাবে বলে নতুন মাঝিকে নৌকা তীরে আনতে বলছে। গোয়ালিনীদের কাছে পারের কড়ি না থাকায় কৃষ্ণবেশধারী নতুন মাঝি গোয়ালিনীদের নয়ালি যৌবন দান করতে বলল। একথা শুনে গোয়ালিনীরা অত্যন্ত রেগে গিয়ে আমাদের বাস্তব জীবনযাত্রায় প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করে -

"ছোটো মুখে বড়ো কথা শোভা নাহি পায়।
দেবতার ভোগ কি কাউয়ায় কভু খায়।।'[৩৯৪]

একদিন শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ থেকে ফিরে এসে অসুস্থতার ভান করে অজ্ঞান হয়ে ভূতলে পড়ে যায়। এ সময় নন্দরানী কপালে করাঘাত করে কাঁদতে থাকে। নন্দরানীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে পালা রচয়িতা দৈনন্দিন জীবনে অতিপ্রচলিত একটি প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করেছেন -

"বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পড়িত যেমন।
যশোদার সঙ্গে কাঁদে গোপগোপিগণ।।"[৩৯৫]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সপ্তম বা শেষ খণ্ডের 'হরিণ কুমার জিরালনী কন্যা পালা'য় একটি হরিণকে স্নান করাতে গিয়ে জিরালনী কন্যা তার দুই শিং-এর মাঝখানে একটি কবচ বাঁধা দেখতে পায়। কবচটি খুলে হাতে নিতেই হরিণটি সুন্দর কুমারে পরিণত হয়। হরিণ কুমারকে দেখে জিরালনী কন্যার যে মানসিক অবস্থা হয়েছিল তার বর্ণনা প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা আমাদের বর্তমান জীবনে প্রচলিত একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"চান্দ যেমুন লাইম্যা আইছে আশমান ছাড়িয়া।
মোইত হইল কইন্যা কুমারকে দেখিয়া।।"[৩৯৬]

পালার অন্যত্র দুলাই রাজকুমার, জিরালনী কন্যাকে বিয়ে করার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু জিরালনী কন্যা যখন জানতে পারল রাজকুমার তার বিমাতার সন্তান অর্থাৎ বৈমাত্রেয় ভাই তখন সে হতভম্ব হয়ে যায়। এসময় জিরালনী কন্যার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা আমাদের বর্তমান সমাজজীবনে অতিপ্রচলিত একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"আশমান ভাইঙ্গ্যা ঠাডার পইড়্‌ল কন্যার মাথায়।
রাইত দিন কান্দে কইন্যা করে হায় হায়।।"[৩৯৭]

'সন্নমালা পালা'য় অপরূপা সুন্দরী সন্নমালাকে বনমধ্যে একাকিনী দেখে সওদাগর সন্নমালাকে উদ্দেশ্য করে আমাদের বর্তমান সমাজে অতিপ্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছে -

"আশমানের চান্দ না কেনে এমুন জমিনে বিছান্‌।
বাপ মাও কিনা আছিল তোমার ধরিতে পরাণ।।"[৩৯৮]

এই পালার অন্যত্র রাজার হুকুমে সাধুর পুত্র সওদাগরকে কেউটে সাপের মুখে ফেলে দেওয়া হলে বিষের জ্বালায় সওদাগর প্রাণত্যাগ করল। এই খবর শুনে সন্নমালা কাঁদতে কাঁদতে নিজেকে সওদাগরের মৃত্যুর জন্য দায়ী মনে করল। এই প্রসঙ্গে সন্নমালা একটি অতি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছে -

"কার বা বাড়া ভাতে গো অমি দিয়াছিলাম ছালি।
কপাল খাইতে মোরে কে দিল রে গালি।।"[৩৯৯]

আলোচ্য প্রবাদটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'বাড়া ভাতে ছাই দেওয়া' হিসাবে প্রচলিত আছে।

এই খণ্ডের 'দেওয়ান ঈশা খাঁ পালা'য় রাজা ধনপত সিং হজ করে ফেরার পথে দিল্লীর নবাব গিয়াসউদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে নবাব তাকে বিশেষভাবে অতিথেয়তা করে। এ প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা আমাদের বর্তমান সমাজজীবনে ব্যবহৃত এক অতি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছেন -

"বড়োর মান বড়োয় জানে অন্যে জাইন্‌ব কি।
কুত্তায় না জানে ভাইরে কিবান চিজ্‌ ঘি।।"[৪০০]

পালার অন্যত্র মমিনা খাতুন দেওয়ানকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে একটি চিঠি লিখে বাঁদীকে দিয়ে দেওয়ানের কাছে পাঠায়। চিঠি পড়ে দেওয়ান আরেকটি চিঠিতে উত্তর জানায় যে, সে হিন্দু হয়ে ধর্মত্যাগ করে মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করতে পারবে না। এই চিঠি পড়ে মোমিনের যে মনের অবস্থা হয়েছিল তা বর্ণনা প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা আমাদের বর্তমান লোকজীবনে অতি প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছেন -

"মমিনা খাতুন লিখন পইড়্যা পাইল লাজ।
দেওয়ানের কথা শুইন্যা পইড়্‌ল মাথায় বাজ।।"[৪০১]

'কবি চন্দ্রাবতী দেবী রচিত রামায়ণ' পালায় মন্দোদরী একটি ডিম্ব প্রসব করলে রাবণ গণককে ডেকে এই আকস্মিক ঘটনার ভবিষ্যৎ বিচার করতে বলল। গণক এসে গণনা করে রাজা রাবণকে জানাল যে, এই ডিম্ব থেকে এক কন্যা জন্ম নেবে এবং সেই কন্যাই হবে স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংসের কারণ। এসময় রাজা রাবণকে উদ্দেশ্য করে গণক আমাদের সমাজজীবনে অতিপ্রচলিত একটি প্রবাদ উচ্চারণ করেছে -

"দৈবের নির্বন্ধ গো রাজা
কভু খণ্ডানো না যায়।
আপনি মইর্‌বা গো রাজা
তুমি এহি কন্যার দায়।।"[৪০২]

আলোচ্য লোকপ্রবাদটি আমাদের বর্তমান ব্যবহারিক জীবনে 'দেবতার লিখন খন্ডানো যায় না' হিসাবে প্রচলিত আছে।

পালার অন্যত্র প্রথমে রামচন্দ্র এবং পরে লক্ষ্মণ সোনার হরিণ ধরতে সীতাকে ফেলে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। এ সময় বনমধ্যে একাকিনী সীতাদেবী একটি উল্লেখযোগ্য প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছে -

"একাকিনী বনমধ্যে গো আমি অভাগিনী।
ভূজঙ্গ রহিল যেমন গো হারাইয়া মনি।।"[৪০৩]

আবার এই পালায় আমরা দেখতে পাই, কৈকেয়ীর কন্যা কুকুয়া রাম-সীতার সুখ শান্তিময় জীবন দেখে সহ্য করতে পারছে না। রাজার ঘরে বিবাহ হলেও কু-স্বভাবের জন্য কুকুয়া দশ বছর ধরে বাপের বাড়িতে পড়ে আছে। কুকুয়ার স্বভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা কবি চন্দ্রাবতী দেবী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ ব্যবহার করেছেন -

"রামসীতার সুখ তার গো পরানে না সহে।
অন্তরে বিষের ছুরি গো হাইস্যা কথা কহে।।"[৪০৪]

আলোচ্য প্রবাদটি আমাদের বর্তমান সমাজজীবনে 'মুখে মধু অন্তরে বিষ' হিসাবে প্রচলিত আছে।

(ট) লোকাচার

সংহত জনগোষ্ঠী বা লোকসমাজ যখন বিশেষ কতকগুলি আচার, নিয়ম বা ক্রিয়ানুষ্ঠান পুরুষানুক্রমে পালন করে চলে তখন সেগুলি লোকাচার বা *Folk ritual* -এ পরিণত হয়। দেশ-কাল পাত্র ভেদে লোকাচারের পরিবর্তন হতে পারে। সেকারণে একই ফল লাভের আসায় ভিন্ন ভিন্ন লোকাচারের সন্ধান মেলে। বীজবপন থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ লোকাচার প্রচলিত আছে। শুভদিন দেখে বীজবপন করার লোকাচার প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত আছে। শুধু মাত্র কৃষির ক্ষেত্রে নয়, মানব জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যা নিয়ে লোকাচার গড়ে ওঠেনি। তবে সমাজ জীবনে যে তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অজস্র লোকাচার গড়ে উঠেছে তা হল জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতি গবেষকের মতে–

''এই তিনটির মধ্যে আবার বিয়ের ক্ষেত্রেই বিশ্বাস, সংস্কার, আচার ইত্যাদির পরিমাণ আনুপাতিকভাবে অন্য দুটির চেয়ে অনেক বেশি। মৃত্যুকেন্দ্রিক আচার-বিধান অন্তত

আমাদের দেশে শাস্ত্রীয় বিধানের দ্বারাই তুলনায় অনেক বেশি শৃঙ্খলিত, তাই বিয়ের আচার বিশ্বাস গুলির পর্যালোচনার সূত্রেই লোকচার ও লোক বিশ্বাসের যথার্থ রূপটির খোঁজ মেলে।" [৪০৫]

লোকচার দ্বিবিধ – শাস্ত্রীয় ও লৌকিক। বিবাহ কেন্দ্রিক লোচারগুলি অনেকাংশে লৌকিক। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিণত সমাজে বিবাহের বেশ কিছু লোকাচার শাস্ত্রীয় মর্যাদা লাভ করেছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, শাস্ত্রাচার বলে স্বীকৃত বিবাহ পদ্ধতিগুলি একসময় লোকচার রূপেই সৃষ্টি হয়েছিল।

লোকাচারের সঙ্গে অনুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। লোকবিশ্বাসের উপর ভর করে লোকাচার লোকসমাজে টিকে থাকে। কোনো বিশ্বাস যখন লোকসমাজের অন্তর্গত মানুষের মনে পুরুষানুক্রমে অবস্থান করে তখন তা লোকবিশ্বাসের পরিণত হয়। লোকচারগুলিকে অবলম্বন করে যে কোনো জাতির আদিম ও প্রাচীন সংস্কার এবং লোকঐতিহ্যের ধারাটি সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তোলাযায়। সভ্যতার অগ্রগতিতে হাজার হাজার বছরের বিবর্তনে আমাদের মনে প্রাগৈতিহাসিককালের অজস্র লোকাচার বহুশতাব্দীর পলিতে চাপা পড়ে আছে। কৃষি, জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহকে আশ্রয় করে লোকাচারগুলি একই রূপে বা ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, কোনো লোকাচারকে নেহাৎ অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কারণ লোকাচারগুলির মধ্যে আত্মগোপন করে আছে সমাজ সত্যের নানাবিধ উপকরণ।

এবার আমরা অনুসন্ধান করে দেখবো, ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত ' প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র অন্তর্গত সাতটি খণ্ডের বিভিন্ন পালায় কী প্রসঙ্গে কোন লোকাচার উল্লেখিত হয়েছে এবং বর্তমান সমাজজীবন যাত্রায় লোকাচারগুলির উপযোগিতাই বা কতখানি।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত 'সুন্দরী মলুয়া' পালায় পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী লোকাচার হিসাবে বিবাহ উপলক্ষে পাত্র শ্বশুর গৃহে উপস্থিত হলে তাকে অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করে নেওয়ার রীতির কথা বলেছেন, পালা অনুসন্ধান করে আমরা জানতে পারি, পালার নায়ক চাঁদবিনোদ বিবাহ উপলক্ষ্যে যখন শ্বশুর বাড়িতে উপস্থিত হয় তখন বিবাহের লোকাচার অনুযায়ী তাকে বরণ ডালায় ধান, দূর্বা, আমপল্লব ইত্যাদি নানা অর্ঘ্য সাজিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। পালা রচনার সমসাময়িককালে লোকসমাজে প্রচলিত এই বিবাহ কেন্দ্রিক লোকাচার লোকঐতিহ্যের ধারায় বর্তমান লোকসমাজে আজ ও বিবাহ ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"উপস্থিত হইল বর হীরাধরের বাড়ী।
অর্গ্যা পুইছ্যা চান্দ বিনোদে নিল যত নারী।।" [৪০৬]

'সুন্দরী মলুয়া পালা'র অন্যত্র পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী বিবাহ কেন্দ্রিক লোকাচার হিসাবে নান্দিমুখ-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। চাঁদবিনোদ ও মলুয়ার বিবাহ সভায় নান্দিমুখ শেষে শুভলগ্নে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হল। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"নান্দিমুখ আদি যত শুভকার্য শেষে।
শুভলগ্নে হইল পরে বিয়া অবশেষে।।" [৪০৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে বিবাহ সভায় প্রচলিত লোকাচার নান্দিমুখ ইত্যাদি শাস্ত্রীয় লোকঐতিহ্যের ধারায় বর্তমান লোকসমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

'সুন্দরী মলুয়া পালা'য় পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী বিবাহ কেন্দ্রিক লোকাচার হিসাবে কালরাত্রি ও ফুলশয্যায়

প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। সাধারণত বিবাহের পর দিনকে কালরাত্রি বলা হয়। এই দিন পাত্রপাত্রীর পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ এবং ফুলশয্যা-পুষ্প সজ্জিত শয্যায় পাত্র-পাত্রীর প্রথম নিশি যাপন। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এই বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচারের উল্লেখ করেছেন–

"কালরাইত গিয়া বিনোদের শুভ রাইত আইল।
শুভরাইতে শ্বশুর বাড়ী ফুল শয্যা হইল।।" [৪০৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালারচনার সামসাময়িক কালে প্রচলিত বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার কালরাত্রি ও ফুলশয্যা বর্তমান লোকসমাজে আজ ও বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার হিসাবে প্রচলিত আছে।

প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত 'চন্দ্রাবতী পালা'য়, পালা রচয়িতা নয়ান চাঁদ ঘোষ লোকাচার হিসাবে বিবাহ স্থির হলে পানের খিলি হাতে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার লৌকিক রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারি, বৈশাখ মাসে শুভদিনে জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর বিবাহ স্থির হলে জয়ানন্দকে পানের খিলি হাতে দিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। শুভকর্ম স্থির হলে পানের খিলি প্রদান করে সম্মান প্রদর্শনের রীতি বর্তমান লোকসমাজে আজ ও প্রচলিত আছে। এই লোকাচার প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"সেইত দিনে বিয়া হইব রাইতে শুভক্ষণ
পানখিল দিয়া করে বিয়ের আয়োজন।।" [৪০৯]

এইখণ্ডের 'দস্যু কেনারামের পালা'য় পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী লোকাচার হিসাবে অন্নপ্রাশন এর কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, লোকদেবী মনসার বরে অপুত্রক যশোধারার পুত্র জন্মগ্রহণ করলে পিতা খেলারাম লোকাচার অনুযায়ী ছয় মাসের শিশুর অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করল। পালার ছত্রে পালা রচয়িতা এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

"ছয় না মাসের শিশু হইলা যখন।
মহা আয়োজনে করে অন্নপরাশন।।" [৪১০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে লোকসমাজে প্রচলিত লোকাচার অন্নপ্রাশন, লোকঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান লোকসমাজে আজও প্রচলিত আছে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'কমলা রাণীর পালা'য় পালা রচয়িতা অধরচাঁদ লোকচার হিসাবে কোচ সম্প্রদায়ের দেবী কামাক্ষীর পূজার নানা উপাচারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। পালা পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত কামাক্ষীদেবীর মন্দিরে কোচজাতির পূজারী প্রতিদিন পাঁঠাবলি দেয় এবং শনিও মঙ্গলবারে মহিষ, বরাহ ইত্যাদি পশুবলি দেয়। আরো লোমহর্ষক ঘটনা হল এই মন্দিরে অমাবশ্যা তিথিতে কামাক্ষী দেবীর পূজার উপাচার হিসাবে নরবলি ও দেওয়া হয়। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

"পাহাড়ের উপরে মন্দির বন জঙ্গলায় ঘিরা।
নিত্যি হয় পাঠা বলি পূজে কোচারেরা।।
মহিষ বরা বলি দেয় শনি মঙ্গল বারে
নরবলি হয় অমাবইস্যার অন্ধকারে।।" [৪১১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে কোচ সম্প্রদায় কামাক্ষী দেবীর পূজায় লোকচার হিসাবে যেমন পশুবলি ও নরবলি দিত, তেমনি বর্তমান লোকসমাজে হিন্দুরদের দেবীকালীর পূজায় পশুবলি ও

নরবলি দেওয়ার প্রমাণ মেলে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কাপালিক দেবীর পূজায় নবকুমারকে বলি দিতে চেষ্টা করেছিল। বর্তমান লোকসমাজে কালী দেবীর পূজায় নরবলি আইনগত ভাবে নিষিদ্ধ হলেও পশুবলি প্রথা আজ ও অব্যাহত আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'রাজকন্যা রূপবতী' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকচার হিসাবে শ্রাদ্ধের উল্লেখ করেছেন। পালা অনুসন্ধান করে আমরা জানতে পারি জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কাঙ্গালিয়ার মৃত্যুর পর মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার হিসাবে শাস্ত্রীয় বিধি অনযায়ী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"কাঙ্গালীয়ার ছরাদ্ধ হইলে দিন দশ পরে।
পুনাইর মড়া ভাইস্যা ছিল নদীর আত্তরে।।" [৪১২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে জেলে সম্প্রদায়ের মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান লোক ঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকসমাজে আজও অপরিহার্য লোকচার হিসাবে প্রচলিত আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'সদাগর কন্যা বগুলা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকাচার হিসাবে ঘরে নতুন ধান উঠলে জয়ধ্বনি করে লক্ষ্মীদেবীকে নানা উপাচারে পূজা দেওয়ার কথা বলেছেন। আলোচ্য পালায় প্রবেশ করে আমরা দেখতে পাই নতুন ধান কেটে বাড়িতে আনলে বাড়ির কুলনারীরা উলুধ্বনি সহকারে ধনদেবী লক্ষ্মীকে নানা উপাচারে পূজা দেয়। পালা রচনার সমসাময়িক কালের এই লোকাচারের দৃশ্য আমরা বর্তমান লোকসমাজে আজ ও দেখতে পাই। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

"ঘরে আইসে নয়া ধনে জয়াদি জুকারে।
অর্ঘ্য দেয় কুলের নারী ঘরের লক্ষ্মীরে।।" [৪১৩]

'সদাগর কন্যা বগুলা' পালার অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকাচার হিসাবে ব্রতপালনের নানা উপাচারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। পালায় মনোনিবেশ করে আমরা জানতে পারি, বগুলার বাবা বগুলাকে এক রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে চায় কিন্তু সদাগর কন্যা বগুলা এক সাধুর পুত্রকে স্বামী হিসাবে অন্তরে স্থান দিয়েছে। সাধুর পুত্র বাণিজ্য যাত্রায় চলে গেলে, রাজপুত্র সদাগর কন্যা বগুলা কে বিবাহ করতে চাইল। এ সময় বগুলা ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করে সাধুর পুত্রের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এই ব্রত পালনের জন্য বগুলা মেষ, মহিষ, কৈতর, পাঁঠা, বস্ত্র, শবরিকলা, চম্পাফুলের মালা, এক সুলক্ষণা সাধুর নন্দন সহ নানাবিধ উপাচারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"মেষ লাগে মৈষ লাগে আর লাগে কৈতরা।
কালাধলা পাঁঠা লাগে বস্ত্রজোড়া জোড়া।।
সোনার চম্পাফুল লাগে আর শবরিকলা।
একলক্ষ সোনার চম্পায় গাইন্থা দিবাম মালা।।
আর লাগে সলক্ষণ এক সাধুর নন্দন।
তাহারে আনিয়া দিবা বর্তের কারণ।।" [৪১৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রচলিত ব্রত পালনের নানা লৌকিক আচারের মতো বর্তমান লোকসমাজে ভিন্ন ভিন্ন লোক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্রত পালনে, নানাবিধ লোকাচার পরিলক্ষিত

হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'দেওয়ান মদিনা' পালায় পালা রচয়িতা মনসুর বয়াতি মুসলিম সম্প্রদায়ের মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার হিসাবে কোরান পাঠ করে কবর দেওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, দুলাল তার স্ত্রী মদিনাকে তালাকনামা লিখে দিয়ে বাইন্যাচঙ্গ শহরে গিয়ে সেকেন্দার দেওয়ানের কন্যা আমিনাকে বিবাহ করলে মনের দুঃখে মদিনা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এরপর মুসলীম শাস্ত্রীয় বিধি মতে লোকাচার অনুসারে কোরান পাঠ করে মদিনাকে কবরস্থ করা হয়। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"পড়া পড়শি মিইল্যা সবে
সেইনা কয়ব্বর খুদিয়া।
মটি দিল ফতোয়া মতন
জানাজা পড়িয়া।।"[৪১৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে মুসলিম সম্প্রদায়ের মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে মৃত ব্যক্তিকে কোরান পাঠ করে কবরস্থ করার যে রীতি, বর্তমান মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তা আজও লোক ঐহিহ্যের ধারায় প্রবহমান।

''প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় নয়ানচাঁদ ঘোষ, রঘুসুত, শ্রীনাথ বানিয়া, দামোদর দাস প্রমুখ পালা রচয়িতাগণ লোকাচার হিসাবে মৃতব্যক্তির প্রজ্জ্বলিত চিতার চারিদিকে প্রদক্ষিণের কথা বলেছেন। পালায় প্রবেশ করে আমরা দেখতে পাই, লীলার মৃত্যুর পর পিতা গর্গ মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার হিসাবে লীলার চিতায় অগ্নি সংযোগ করে প্রজ্জ্বলিত চিতার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করল। পালা রচনার সমসাময়িক কালে মৃত্যুকেন্দ্রিক এই লোকাচার বর্তমান লোকসমাজে আজও প্রচলিত আছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের এই মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকচার সম্পর্কে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"বহুকষ্টে জ্বালায়্যা চিতা
গর্গ চিতা প্রদক্ষিণ করে।
কন্যার লাগিয়া গর্গ
কান্দে হাহাকারে।।"[৪১৬]

তৃতীয় খণ্ডের 'ভেলুয়া সুন্দরী-আমির সাধুর পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকাচার হিসাবে বিবাহাদি শুভকর্মের স্থির সিদ্ধান্ত হলে সম্মতি স্বরূপ পানের খিলি প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারি, আমির সাধু ও ভেলুয়া সুন্দরীর বিবাহের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হলে আমির সাধু বাণিজ্যে যাওয়ার আগে ভেলুয়া সম্মতি স্বরূপ তার হাতে পানের খিলি প্রদান করল। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

"কইন্যারে লইয়া আমির বুগ জুড়াইল।
হাতে হাতে কইন্যার পানের খিলি খাইল।।"[৪১৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িককালে প্রচলিত বিবাহাদি শুভকর্মে সম্মতি সূচক লোকচার পানের খিলি প্রদান, বর্তমান লোকসমাজে আজও প্রচলিত আছে।

তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'কমলা কন্যার পালা'য় পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান লোকাচার হিসাবে বাড়িতে নতুন ধান উঠলে কুলনারীগণের উলুধ্বনি দেওয়া এবং নতুন ধানের নতুন অন্নে চিড়া, পুলি, পিঠা প্রস্তুত করার কথা

উল্লেখ করেছেন। পালা অনুসন্ধান করে আমরা জানতে পারি, পূর্ববঙ্গে অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাকলে শুভদিনে সেই ধান কেটে ঘরে তুললে কূলনারীরা লোকাচার অনুযায়ী উলুধ্বনি করে। এরপর নতুন ধান থেকে প্রস্তুত চালে চিড়া, পিঠা প্রস্তুত করে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। এই পাকা ধান কেটে আনায়ন উৎসবকে পূর্ববঙ্গে আগ্‌বাড়ানো উৎসব বলা হয়। কমলা কন্যা রাজপুত্র প্রদীপ কমারের বাড়িতে বসে এই নবান্ন উৎসবের কথা ভাবছে। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"জয়াদি জুকার পড়ে
পর্‌তি ঘরে ঘরে।
নয়া ধানের নয়া অন্নে
চিড়া পিঠা করে।।
পায়েস খিচুরি রাইন্ধ্যা
দেয় দেবের পারন।
লক্ষ্মীপূজা করে লোকে
লক্ষ্মী পাইবার কারণ।।"[৪১৮]

উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রচলিত লোকাচার অনুসারে জয়াদি জুকার সহ নবান্ন উৎসব ও লক্ষ্মীপূজা বর্তমান লোকজীবন যাত্রায় আজ ও প্রচলিত আছে।

'কমলা কন্যা পালা'র অন্যত্র পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার হিসাবে কলাতলায় বরণ, পাত্রীর সাতপাক ঘোরা ও শুভদৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। পালা অনুসন্ধান করে আমরা জানতে পারি, কমলা কন্যা ও প্রদীপ কুমারের বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রথমে কলাতলায় বিধিমতে নানা উপাচারে উভয়কে বরণ করা হয়। এরপর লোকাচার অনুযায়ী কমলা কন্যা, প্রদীপ কুমারের চারিদিকে সাতপাক ঘোরে। অবশেষে দুজনের মুখচান্দিকে অর্থাৎ শুভদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। বিবাহকেন্দ্রিক এই সমস্ত লোকাচার প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"এইমতে সখীগণ করিলে সাজন।
বিধিমতে কলাতলে হইল বরণ।।
সাতপাক ঘুরে কন্যা বরের চৌদিকে।
শুভযোগে হইল দুহার মুখ চান্দিকে।।"[৪১৯]

উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রচলিত বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার কলাতলায় বরণ, সাতপাক ঘোরা ও শুভদৃষ্টি ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বিধি লোকঐতিহ্যের হাত ধরে বর্তমান লোকসমাজে আজও নিঁখুত ভাবে প্রচলিত আছে।

তৃতীয় খণ্ডের 'শীলা দেবীর পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার হিসাবে পাত্রীর অঙ্গমার্জন এবং বারোতীর্থের জলে স্নান করানোর কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, শীলা দেবীর বিবাহের দিন তাকে গাইষ্টঘিলা মাখিয়ে বারোতীর্থের জল দিয়ে স্নান করানো হয়। এই গাইষ্টঘিলা আসলে মসুরডাল, হলুদ, চন্দন ও মাখন মিশ্রিত অঙ্গমার্জন। লোকচার অনুযায়ী এই অঙ্গমার্জন ও বারোতীর্থের জলে স্নান করানো আসলে অশুভ সমস্ত কিছুকে দূর করে মঙ্গল কামনা করা। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"আমলকি গাইষ্টঘিলা ভালা বাঁটুনী বাঁটিল।
বারোতীর্থের জল দিয়া কন্যারে সিনান করাইল।।"[৪২০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিবাহ কেন্দ্রিক লোকাচার অনুযায়ী পাত্রীর অঙ্গমার্জন ও বারোতীর্থের জলে স্নান করানোর রীতি বর্তমান লোক সমাজে আজ ও প্রচলিত আছে। বর্তমানে এই অঙ্গমার্জন আসলে গায়ে হলুদ দেওয়া এবং বারোতীর্থের জলে স্নান করানো আসলে জলের সঙ্গে যেকোনো তীর্থক্ষেত্র থেকে আনা জল মিশিয়ে পাত্র বা পাত্রীকে স্নান করানো।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্গত 'রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার হিসাবে বিবাহের দিন পাত্রীর অঙ্গমার্জন এবং স্নান করানোর কথা উল্লেখ করেছেন। পালায় মনোনিবেশ করে আমরা জানতে পারি, রঙ্গমালা সুন্দরীর বিবাহের দিন এয়োস্ত্রীরা গান গাইছে এবং লোকাচার অনুযায়ী রঙ্গমালাকে গাইষ্টঘিলা মাখিয়ে স্নান করাচ্ছে। এই গাইষ্টঘিলা আসলে মসুরডাল, হলুদ, চন্দন ও মাখন মিশ্রিত অঙ্গমার্জন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই একই লোকাচার 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডের 'কমলা কন্যা' পালা ও 'শীলা দেবী'র পালায় পরিলক্ষিত হয়। বিবাহ কেন্দ্রিক আলোচ্য লোকাচার সম্পর্কে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"চলনা তোরা সবে মোরা জল সিনানে যাই।।
মাসমিত্রা বোলাই রঙ্গরে কইতে লাগিল।
গাইষ্টঘিলা চুয়া চন্নন অঙ্গে মাখি দিল।।"[৪২১]

উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে উল্লেখিত আলোচ্য লোকাচার বর্তমান লোকসমাজে আজ ও প্রচলিত আছে।

এই একই পালায় অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার হিসাবে মালা বদলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। পালার প্রবেশ করে আমরা জানতে পারি, রঙ্গমালা সুন্দরী ও রাজচন্দরের বিবাহে লোকাচার হিসাবে বিবাহসভায় মালা বদলের রীতি প্রচলিত ছিল। রাজচন্দর রঙ্গমালা সুন্দরীর গলায় মোতির মালা এবং রঙ্গমালা রাজচন্দরের গলায় চম্পাফুলের মালা পরিয়ে দেয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে এই পাত্র-পাত্রীর মালা বদলের রীতি আজও বর্তমান লোকসমাজে অক্ষুন্ন আছে। এই মালা বদল প্রসঙ্গে 'রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই' পালায় পালা রচয়িতা বলেছেন–

"এই কথা বলি রাজচন্দর রঙ্গর গলাত মালা দিল।
চম্পা ফুলর মালা রঙ্গ চৌধ্রীর গলাত পরাইল।।"[৪২২]

চতুর্থ খণ্ডের 'ভরার মেয়ের গান' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকাচার হিসাবে ভাদ্রমাসে ভাদুইষষ্ঠী পূজার দিন কলার খোলে প্রস্তুত ডিঙ্গায় করে জলস্রোতে নানা উপাচার ভাসানোর কথা বলেছেন। পালা অনুসন্ধান করে আমরা জানতে পারি, ভরার মেয়ে ভাদ্র মাসে ভাদুই ষষ্ঠীর দিনে তার ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীর প্রসাদ, ধান দূর্বা, হলুদ মাখা সুতা প্রভৃতি কলার খোল দিয়ে প্রস্তুত ডিঙ্গায় করে নদীস্রোতে ভাসিয়ে দেয়। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

"আইজ ভাদুই ষষ্ঠীর দিনে রে ভাই
আমি তোমার লাগিয়া।
ভাসাইলাম পাইট্যার ডিঙ্গা
শেষ চৌক্ষের জল দিয়া।।"[৪২৩]

উল্লেখ্য যে, পালা রচনার অব্যবহিত পূর্বকালে প্রচলিত এই ভাদুইষষ্ঠী পূজা কেন্দ্রিক লোকাচার আজও

বর্তমান লোকসমাজে প্রচলিত আছে।

চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্গত 'মানিকতারা ডাকাইত' পালায় পালা রচয়িতা সেখ আমির উদ্দিন বিবাহ কেন্দ্রিক লোকাচার হসাবে কন্যার শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার প্রাক্কালে সমস্ত ঋণ শোধ করার কথা বলেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, সাধুশীলের কন্যা মানিকতারা বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার প্রাক্কালে লোকাচার অনুযায়ী সমস্ত পিতৃ-মাতৃ ঋণ শোধ করার কথা বলেছে। পালা রচয়িতা পালার ছত্রে এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

"তারার পাছে খাড়াইল মাও টোনা যে পাতিল।
দুই হস্তে এন্দুরের মাটি মানিকতারা দিল।।
এতদিন যা খাইছি মাও গো ফিরায়্যা দিলাম তাই।
জন্মের মতন শোধ হইল ঋণ অহন আমি যাই।।"[৪২৪]

উল্লেখ্য যে, পালা রচনার অব্যবহিত পূর্বকালে প্রচলিত আলোচ্য লোকাচার বর্তমান লোকসমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানে আজ ও প্রচলিত আছে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত 'কমল সদাইগরের পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকাচার হিসাবে বৈশাখ মাসে তুলসী বৃক্ষে জল ঝরা বাঁধার কথা বলেছেন। পালা পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারি, কমল সদাইগরের স্ত্রী সুরঙ্গিনী রাজ্যের মঙ্গল কামনায় সারাবছর নানারকম পূজা ও ব্রত পালন করে। হিন্দু ধর্মে তুলসী বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়। সেইমত বৈশাখ মাসে তুলসী বৃক্ষে জল ঝরা বেঁধে সমাজ পরিবারের মঙ্গল কামনা করা হয়। রাণী সুরঙ্গিনী জ্যৈষ্ঠ মাসে নানা উপাচারে ষষ্ঠী পূজা ও করে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সুরঙ্গিনীর নানা লোকাচার পালন উপলক্ষে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন –

"বৈশাখ মাসে তুলসী বিরিক্ষে বান্ধি দেয় ঝরা।
জষ্ঠি মাসে যষ্ঠি পূজা আর পূজে তারা।।"[৪২৫]

উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে বৈশাখ মাসে তুলসী বৃক্ষে জল ঝরা বাঁধা বর্তমান লোকসমাজে ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের এক বিশেষ ধর্মীয় লোকাচার।

'কমল সদাইগরের পালা'র অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা হিন্দু ধর্মের লোকাচার হিসাবে কার্তিক পূজার ব্রত পালন ও আকাশ প্রদীপ জ্বালানোর কথা উল্লেখ করেছেন। পালায় প্রবেশ করে আমরা জানতে পারি, কমল সদাইগরের শুদ্ধমতি স্ত্রী কার্তিক মাসে কার্তিক পূজার ব্রত পালন করে এবং আকাশ প্রদীপ জ্বালায়। আকাশ প্রদীপ জ্বালানো আসলে জীবনের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে আলোর বার্তা বহন করে আনা। কুৎসিৎকে দূরে ঠেলে সুন্দরের আমন্ত্রণ। আলোচ্য ধর্মীয় লোকাচার প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"শ্যামা পূজা কার্তিক পূজা বর্ত উপাসে।
আকাশ প্রদীপ দেয় কত্ত মনের হরষে।।"[৪২৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রচলিত ধর্মীয় লোকাচার কার্তিক পূজার ব্রত পালন ও আকাশ প্রদীপ জ্বালানো বর্তমান লোকসমাজে আজও হিন্দুধর্মের লোকাচার হিসাবে প্রচলিত আছে।

'কমল সদাইগরের পালা'র অন্যত্র অজ্ঞাত পালা রচয়িতা মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার হিসাবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন। রাণী সুরঙ্গিনীর মৃত্যুর পর লোকাচার হিসাবে শাস্ত্রীয় বিধি মতে শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায় মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনায় এই শ্রাদ্ধের নানা লোকাচার পালন করে। পালার ছত্রে পালা রচয়িতা মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার শ্রাদ্ধ কর্মের উল্লেখ করেছেন–

"সুরঙ্গিনী নারীর হইল চন্দ্রধেনু কর্ম।
আলোক রথে স্বর্গে গেল ধন্য নারী জন্ম।।"[৪২৭]

পালা রচনার অব্যবহিত পূর্বকালে প্রচলিত ধর্মীয় লোকাচার শ্রাদ্ধ কর্ম, বর্তমান লোকসমাজে হিন্দু মাত্রেরই মৃত্যুর পর মৃত আত্মার শান্তি কামনায় আজও প্রচলিত আছে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত 'ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকাচার হিসাবে উলুধ্বনি দেওয়া, ধান, দূর্বা, পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে বরণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, ধার্মিক সাধু বাণিজ্য করে বহু ধন রত্ন নিয়ে নিজের বাড়ির ঘাটে ডিঙ্গা ভিড়ালে লোকাচার অনুযায়ী প্রথমে পুরনারীরা উলুধ্বনি দিল তারপর পুরনারীরা নৌকার গলুইয়ে ধান, দূর্বা, পুষ্প, চন্দন রেখে নৌকাকে বরণ করে নিল। নৌকার মঙ্গল এবং বাণিজ্যের উন্নতি কামনায় আলোচ্য লোকাচার বণিক মাত্রই বিধিমতে পালন করে থাকে। পালা রচয়িতা এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

"ঘাটে লাগাইল ডিঙ্গা ধার্মিক সদাইগর।
জয়াদি জুকার পড়ে পুরীর ভিতর।।
ধান্য দুর্ব্বা লইয়া সাধুর যত পুর নারী।
ডিঙ্গা অর্ঘিবারে আইল কইরা ত্বরাতরি।।
পুষ্প চন্দন দয়া ডিঙ্গার গলইয়ের উপর
দুর্গা পদ্মা নাম কইর‍্যা নোয়াইল শির।।"[৪২৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পালা রচনার সমসাময়িক কালে উল্লেখিত লোকাচার অনুযায়ী নানা উপাচারে নৌকাকে বরণ করে নেওয়ার রীতি বর্তমান লোকসমাজে বণিক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে।

ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত 'বাইন্যা বউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকাচার হিসাবে লক্ষ্মীর ঝাঁপি আনার সময় পথে জল ছিটানো, কুলাচার মেনে গুরুপূজা ও কুমারীপূজা করার কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারি, দীর্ঘ বারো বছর পর বাইন্যা বউ এর লক্ষ্মীর ঝাঁপি নদীর জলে ভেসে ফিরে এলে, ভরার পূজার শেষে বাইন্যা বউ এর পোলা লক্ষ্মীর ঝাঁপি মাথায় করে চলল। লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে যাওয়ার আগে লোকাচার অনুযায়ী পথে জল ছিটানো হল। এরপর সমস্ত কুলাচার মেনে গুরুপূজা ও কুমারী পূজা করা হল। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"ঝারি হস্তে কন্যায় দিল পন্থেজলের ছিটা।
বড়ো ঘরে উইঠ্‌ল ভরা কইরা কত ঘটা।।
ঘরে গিয়া কুলাচার যতেক আছিল।
গুরুপূজা কুমারীপূজা সগলি হইল।।"[৪২৯]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রচলিত আলোচ্য লোকাচার বর্তমান লোকসমাজে আজও প্রচলিত আছে।

ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত 'মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পালায় পালা রচয়িতা সুলা লোকাচার হিসাবে নারীগণের উলুধ্বনির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। পালায় প্রবেশ করে আমরা দেখতে পাই, ছিদ্র কলসীতে করে জল নিয়ে শ্রীরাধিকা যখন সাঁকোতে উঠল এবং সাঁকো পার হয়ে অসাধ্য সাধন করল তখন সমস্ত নারীগণ হরি ধ্বনি করে উলুধ্বনি দিল। এ প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা বলেছেন–

"চাইর দিগে জয় জয় হরি হরি সবে কয়

নারীগণে দেয় উলুধ্বনি।

জয় রাধা জয় রাধা বলি কেহ দেয় করতালি

আনন্দে বিভোর নন্দরাণী।।"[৪৩০]

উল্লেখ্য যে পালা রচনার সমসাময়িক কালে নারীগণের কণ্ঠে হরি ধ্বনি ও উলুধ্বনি লোকাচার হিসাবে বর্তমান লোকসমাজে যেকোনো পূজা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আজও প্রচলিত আছে।

''প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সপ্তম খণ্ডের অন্তর্গত 'হরিণ-কুমার জিরালনী কন্যা' পালায় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকাচার হিসাবে বিবাহের পূর্বে পাত্রীর অঙ্গমার্জন হিসাবে গাইষ্টঘিলা মাখার কথা উল্লেখ করেছেন। পালায় প্রবেশ করে আমরা দেখতে পাই জরালনী কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে দাসদাসীগণ বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার অনুসারে গাইষ্টঘিলা বা মসুর ডাল, হলুদ, চন্দন ও মাখন মিশ্রিত অঙ্গমার্জন মাখাতে চেয়েছে। জিরালনী কন্যা অবশ্য বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সঙ্গে এই অনৈতিক বিবাহে রাজী না হয়ে ঘর ছেড়েছে। বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার এই অঙ্গমার্জন সম্বন্ধে পালা রচয়িতা পালার ছত্রে বলেছেন–

"সোনার বাটায় গাইষ্টঘিলা যতনে লইয়া।
ধাই দাসী চলে সঙ্গে উলাস করিয়া।।"[৪৩১]

উল্লেখ্য যে, পালা রচনার অব্যবহিত পূর্বকালে প্রচলিত আলোচ্য এই লোকাচার বর্তমানে লোকসমাজের বিবাহ কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে 'গায়ে হলুদ' হিসাবে প্রচলিত আছে। সমস্তরকম অশুভকে দূর করা উপলক্ষে এই অঙ্গমার্জনের ব্যবস্থা।

সপ্তম খণ্ডের অন্তর্গত সন্নমালার পালা'য় অজ্ঞাত পালা রচয়িতা লোকাচার হিসাবে ধান, দুর্বা, সিন্দুর, ঘিয়ের বাতি প্রভৃতি উপাচারে বাণিজ্য ডিঙাকে বরণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। পালা পাঠ করে আমরা জানতে পারি, সাই সদাইগর বাণিজ্য করে বহু ধনদৌলত নিয়ে সপ্ত ডিঙ্গায় করে দেশে ফিরলে, তার সাত স্ত্রী ধান দূর্বা, সিন্দুর ইত্যাদি উপাচারে সপ্ত ডিঙ্গাকে বরণ করে নিল এবং সমস্ত ধনদৌলত গৃহে তুলে নিল। এ প্রসঙ্গে পালার ছত্রে পালা রচয়িতা বলেছেন–

"সাই সদাইগরের সাত বউ। ডিঙ্গার গলুয়ে ধান,
দূর্বা, সিন্দুর, ঘিয়ের বাত্তি, সাতবরণ ডালা, সাত বউ
সাত ডিঙ্গা অর্ঘ্যা পুচ্ছ্যা ঘরে ধন দৌলত তুল্যা নিল।।"[৪৩২]

উল্লেখ্য যে, পালা রচনার সমসাময়িক কালে লোকাচার হিসাবে বাণিজ্য ডিঙ্গাকে বরণ করে নেওয়ার রীতি বর্তমান লোকসমাজে যারা জলপথে ব্যবসা বাণিজ্য করে বা খেয়া পারাপার করে তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

সপ্তম খণ্ডের অন্তর্গত 'কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ' পালায় পালা রচয়িতা চন্দ্রাবতী লোকাচার হসাবে ধান, দূর্বা, ঘিয়ের বাতি, ধূপ, ধুনা জ্বালিয়ে আরতি করার কথা বলেছেন। পালা পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারি, মিথিলা নগরের মাধব জেলে একদিন নদীতে জাল ফেলে একটি সোনার কটরা পায়। সোনার কটরা নিয়ে ঘরে ফিরলে তার স্ত্রী লোকাচার অনুযায়ী কটরার গায়ে পাঁচটি সিঁদূরের ফোটা দিয়ে ধান, দূর্বা, ঘিয়ের বাত্তি, আমপল্লব, জলের ঘট, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি সহকারে আরতি করে। এ প্রসঙ্গে পালার ছত্রে পালা রচয়িতা বলেছেন–

"জয়াদি জোকার দিয়া গো, মঙ্গল জানায়।
পঞ্চ সিন্দূরের ফোটা গো, দিল কটরার গায়।।
ধান্য দূর্বা আইলপনা গো, যতা দিল বিধিমতে।
আমের শাখা দিয়া রাখে গো, ভরা জলের ঘটে।।
পঞ্চগাছি সলিতা দিয়া গো, জ্বালে ঘিয়ের বাতি।
ধূপ ধুনা জ্বালাইয়া গো, করিল আরতি।।" [৪৩৩]

পালা রচনার সমসাময়িক কালে প্রচলিত আলোচ্য লোকাচার সমূহ বর্তমান লোকজীবন যাত্রায় যেকোনো মঙ্গলসূচক অনুষ্ঠানে এবং পূজাপার্বণে ধান, দূর্বা, সিঁদূর, জলের ঘট, আমপল্লব, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি সহকারে আরতি আজ ও প্রচলিত আছে।

——

তথ্যসূত্র ঃ—

১। Frederick Engles : Dialectics of Nature, Moscow - 1954, Page No - 233

২। সংগৃহীত, সুনীল চক্রবর্তী - লোকায়ত বাংলা, দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৪১৮, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলি - ৯, পৃষ্ঠা নং - ৩৮ (বৃহদারণ্যক উপনিয়দের ১.৩.১৮ নং শ্লোক)।

৩। George Thomson : Studies an Ancient Greek Society, 1949, Page No - 451

৪। George Thomson : Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend. সংগৃহীত, চূড়ামণি হাটি (সম্পাদিত), - লোকসংস্কৃতির দিগ্‌দিগন্ত, গ্রন্থবিকাশ, কলি - ৭৩, পুনর্মুদ্রণ - ২০১১, পৃষ্ঠা নং - ২১৬।

৫। R. V. William : Folksong Encyclopaedia Britanica, সংগৃহীত, চূড়ামণি হাটি (সম্পাদিত) - লোকসংস্কৃতির দিগ্‌দিগন্ত, গ্রন্থবিকাশ, কলি - ৭৩, পুনর্মুদ্রণ - ২০১১, পৃষ্ঠা নং - ২১৬।

৬। International Folksong Council প্রদত্ত লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা, ১৯৫৪। সংগৃহীত, দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাদিত) - লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় সংযোজন - ২০১৩, পুস্তক বিপণি, কলি - ৯, পৃষ্ঠা নং -১৩৭।

৭। সংগৃহীত, চূড়ামণি হাটি (সম্পাদিত) - লোকসংস্কৃতির দিগ্‌দিগন্ত, পুনর্মুদ্রণ - ২০১১, গ্রন্থবিকাশ, কলি - ৭৩, পৃষ্ঠা নং - ২১৬।

৮। George Herzog : Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend, সংগৃহীত, চূড়ামণি হাটি (সম্পাদিত) - লোকসংস্কৃতির দিগ্‌দিগন্ত, পুনর্মুদ্রণ - ২০১১ গ্রন্থাবিকাশ, কলি - ৭৩, পৃষ্ঠা নং - ২১৬।

৯। সংগৃহীত, দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাদিত) - লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় সংযোজন - ২০১৩, পুস্তক বিপণি, কলি - ৯, পৃষ্ঠা নং - ১৩৭-১৩৮।

১০। সংগৃহীত, চূড়ামণি হটি (সম্পাদিত) - লোকসংস্কৃতির দিগ্‌দিগন্ত , পুনর্মুদ্রণ - ২০১১, গ্রন্থবিকাশ, কলি - ৭৩, পৃষ্ঠা নং - ২১৬।

১১। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭০, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, বাইদ্যা কন্যা মহুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৫।

১২। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৮৫।

১৩। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭০, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, সুন্দরী মলুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং - ১০৪।

১৪। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭০, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, চন্দ্রাবতী পালা, পৃষ্ঠা নং - ২২৬।

১৫। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, দেওয়ান মদিনা পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৭৬।

১৬। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ২৯০।

১৭। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (তৃতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, লীলা কন্যা কবি কঙ্ক পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৭।

১৮। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ২৭।

১৯। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৫।

২০। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (তৃতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৩৮।

২১। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৬৯।

২২। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (তৃতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কমলা কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং - ২১৬।

২৩। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ২৫৪।

২৪। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭২, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, রঙ্গমালা সুন্দরী পালা, পৃষ্ঠা নং - ৫৭।

২৫। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭২, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, মানিক তারা ডাকাইত পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৭১।

২৬। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কমল সদাইগরের পালা, পৃষ্ঠা নং - ৬৫।

২৭। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কবরের কান্না পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৭৩।

২৮। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৮৪।

২৯। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৫, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, বাল্য স্মৃতি স্মরণে উদবাস্তুর কান্না পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৫৩।

৩০। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৫৭।

৩১. সংগৃহীত, পল্লব সেনগুপ্ত — লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা-৯, পৃষ্ঠা নং - ২৩৪।

৩২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, বাইদ্যা কন্যা মহুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং - ১০।

৩৩. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৫

৩৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সুন্দরী মলুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৩৮

৩৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (তৃতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, ''লীলা কন্যা কবি কঙ্ক পালা, পৃষ্ঠা নং - ২০

৩৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (তৃতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সুনাই সুন্দরী বা দেওয়ান ভাবনা পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩১০

৩৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (পঞ্চম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, ছুরত জামাল অধুয়া সুন্দরী পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৮৪

৩৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩০৭

৩৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (পঞ্চম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কবরের কান্না পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৪২

৪০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৪, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, মলয়া কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৬৫

৪১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (সপ্তম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, দেওয়ান ঈশা খার পালা, পৃষ্ঠা নং - ২১৯

৪২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (সপ্তম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ। পৃষ্ঠা নং - ৩২১

৪৩। রবীন্দ্র মজুমদার - বাংলার লোকশিল্প, প্রথম সংস্করণ ১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৩, রত্নসাগর গ্রন্থমালা, কলিকাতা - ২৯, পৃষ্ঠা নং- ৯

৪৪। তদেব। পৃষ্ঠা নং- ১৯

৪৫। তদেব। পৃষ্ঠা নং- ১২

৪৬। ড. পল্লব সেনগুপ্ত - লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা - ৯, পৃষ্ঠা নং- ২৪০

৪৭। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭০, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, বাইদ্যা কন্যা মহুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং- ৭১

৪৮। তদেব। পৃষ্ঠা নং- ৭৫

৪৯। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭০, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, সুন্দরী মলুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং - ১০৮

৫০। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৭৭

৫১। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭০, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, শ্যামরায়ের পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৫২

৫২। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৫৯

৫৩। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, কাঞ্চন কন্যা পালা, পৃষ্ঠা নং - ৪৯

৫৪। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, রাজকন্যা রূপবতী পালা, পৃষ্ঠা নং - ১২৯

৫৫। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৪৯

৫৬। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (তৃতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল . মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, লীলা কন্যা কবি কঙ্ক পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৩

৫৭। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৭৮

৫৮। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (চতুর্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭২, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। কলি - ১২, রঙ্গমালা সুন্দরী ও চৌধুরীর লড়াই পালা, পৃষ্ঠা নং - ৫৭

৫৯। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৭১

৬০। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (চতুর্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭২, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। কলি - ১২, মানিকতারা ডাকাইত পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৭১

৬১। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (চতুর্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭২, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। কলি - ১২, মইষাল বন্ধু সাঁজুতি কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৮৮

৬২। তদেব।পৃষ্ঠা নং - ৩৮১

৬৩। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৮২

৬৪। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (পঞ্চম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কমল সদাইগরের পালা, পৃষ্ঠা নং - ৯

৬৫। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (পঞ্চম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান সখিনা বিবি পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৪৪

৬৬। তদেব, পৃষ্ঠা নং - ১৪৬

৬৭। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (পঞ্চম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কবরের কান্না পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৫৮

৬৮। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৭১

৬৯। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৪, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, ভেলুয়া সুন্দরী মদন সাধুর পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৬০

৭০. শেখ আবদুল জলিল—ময়মনসিংহের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা, জেলা প্রশাসন, ময়মনসিংহ, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা নং-১৬

৭১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, বাইদ্যা কন্যা মহুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং-৯

৭২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, সুন্দরী মলুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং - ১০৫

৭৩. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৬১

৭৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, কেনা ডাকাতের পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৫৭

৭৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, আয়না বিবি পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৯২

৭৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, কাঞ্চন কন্যা পালা, পৃষ্ঠা নং-৪৭

৭৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, কমলারানীর পালা, পৃষ্ঠা নং-৭৯

৭৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, রাজকন্যা রূপবতী পালা, পৃষ্ঠা নং-১৪৯

৭৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, পীর বাতাসী কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং-১৭৩

৮০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, দেওয়ান মদিনা পালা, পৃষ্ঠা নং-২৯৮

৮১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত)- প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২,। আমিনা বিবি ও নছর মালুম পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৩২

৮২. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৩৩৮

৮৩. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৩৬৩

৮৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (তৃতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, লীলা কন্যা কবি কঙ্ক পালা, পৃষ্ঠা নং-১৩

৮৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত)- প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (তৃতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা, পৃষ্ঠা নং-১০৯

৮৬. তদেব। পৃষ্ঠা নং-১৩১

৮৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (তৃতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, কমলা কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং-১৮৪

৮৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং-২০৭

৮৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (তৃতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, কাফেনচোরা পালা, পৃষ্ঠা নং-২৭০

৯০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (তৃতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, শীলাদেবীর পালা, পৃষ্ঠা নং-৪১৫

৯১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (চতুর্থ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, রঙ্গমালা সুন্দরী ও চৌধুরীর লড়াই পালা, পৃষ্ঠা নং-২১

৯২. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৩১

৯৩. তদেব। পৃষ্ঠা নং-১৪৯

৯৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (চতুর্থ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, ভরার মেয়ের গান, পৃষ্ঠা নং-২০৮

৯৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (চতুর্থ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, মানিক তারা ডাকাইত পালা, পৃষ্ঠা নং-২৪৫

৯৬. তদেব। পৃষ্ঠা নং-২৫৫

৯৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং-২৮৮

৯৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (চতুর্থ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, নেজাম ডাকাইত পীরের কেরামতি পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৩১

৯৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (পঞ্চম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ -১৯৭৩, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, কমলসদাইগরের পালা, পৃষ্ঠা নং-১৯

১০০. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৫৬

১০১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (পঞ্চম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ -১৯৭৩, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, কবরের কান্না পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৬৫

১০২. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৩৬৭

১০৩. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৩৬৮

১০৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, ভেলুয়া সন্দরী-মদন সাধুর পালা, পৃষ্ঠা নং-১০৯

১০৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, মলয়া কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং-২৩৪

১০৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি-১২, হাতি খেদার গান পালা, পৃষ্ঠা নং-৩১৫

১০৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (সপ্তম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, রতন ঠাকুরের পালা, পৃষ্ঠা নং-৮

১০৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (সপ্তম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, হরিণকুমার-জিরালনী-কন্যার পালা। পৃষ্ঠা নং-৭১

১০৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (সপ্তম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সন্নমালার পালা, পৃষ্ঠা নং-১১৩

১১০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (সপ্তম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ পালা, পৃষ্ঠা নং-২৯২

১১১. জসীমউদ্দীন — পূর্ববঙ্গের নক্সীকাঁথা ও শাড়ি। সংগৃহীত, বরুন কুমার চক্রবর্তী ও দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত — বাঙলার লোকসংস্কৃতি, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ২০১৩, কলিকাতা - ৯, পৃষ্ঠা নং-১০২।

১১২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, বাইদ্যা কন্যা মহুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং-৬২

১১৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সুন্দরী মলুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং-১৫৫

১১৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, আয়না বিবির পালা, পৃষ্ঠা নং-৩০৬

১১৫. তদেব। পৃষ্ঠা-৩২৭

১১৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, শ্যাম রায়ের পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৬২

১১৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড) প্রথম সংস্করণ-১৯৭১ ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত কলিকাতা-১২, কাঞ্চন কন্যা পালা, পৃষ্ঠা নং-৪৯

১১৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, রাজকন্যা রূপবতী পালা, পৃষ্ঠা নং-১৬৪

১১৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭১, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, সদাগর কন্যা বগুলা পালা, পৃষ্ঠা নং-২৩২।

১২০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭১, ফার্মা কে .এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, আমিনা বিবি ও নছর মালুম পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৩৭

১২১. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৩৪৮

১২২. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৩৪৯

১২৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭১, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, 'ভেলুয়া সুন্দরী-আমির সাধুর পালা, পৃষ্ঠা নং-১২২

১২৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং-১৩৪

১২৫. তদেব। পৃষ্ঠা নং-১৫২

১২৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭১, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, কমলা কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং-১৮১

১২৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং-২৫৩

১২৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭১, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, কাফেন চোরা পালা, পৃষ্ঠা নং-২৭৫

১২৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭১, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, সুনাই সুন্দরী পালা, পৃষ্ঠা নং-২৯৯

১৩০. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৩০৯

১৩১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭১, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, শীলাদেবীর পালা, পৃষ্ঠা নং-৪৩২

১৩২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭২,

ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই পালা, পৃষ্ঠা নং-৯৯

১৩৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭২, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, মানিকতারা ডাকাইত পালা, পৃষ্ঠা নং-২৫৪

১৩৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং-২৫৮

১৩৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭২, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, নেজাম ডাকাইত পীরের কেরামতি পালা, পৃষ্ঠা নং-৩১৬

১৩৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭৩, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, কমল সদাইগরের পালা, পৃষ্ঠা নং-২৯

১৩৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭৩, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান সখিনা বিবির পালা, পৃষ্ঠা নং-১৯২

১৩৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭৩, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, পরীবানু বেগমের পালা, পৃষ্ঠা নং-২১৭

১৩৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭৩, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, সুজাতনয়ার বিলাপ পালা, পৃষ্ঠা নং-২৪৫

১৪০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭৩, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, ছুরত জামাল-অধুয়া সুন্দরী পালা, পৃষ্ঠা নং-৩০৯

১৪১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭৪, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, হাতিখেদার গান পালা, পৃষ্ঠা নং-৩১৪

১৪২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭৪, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৫৯

১৪৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭৫, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, হরিণকুমার জিরালনী কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং-৫০

১৪৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭৫, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, দেওয়ান ইশা খাঁর পালা, পৃষ্ঠা নং-২৪০

১৪৫. তদেব। পৃষ্ঠা নং-২৪০

১৪৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ — ১৯৭৫ ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, কবি চন্দ্রাবতী দেবী বিরচিত রামায়ণ পালা, পৃষ্ঠা নং-২৯৩

১৪৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং-২৯৬

১৪৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, বাইদ্যা কন্যা মহুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং-১৮

১৪৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৩৮

১৫০. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৫০

১৫১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সুন্দরী মলুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং-১০৭

১৫২. তদেব। পৃষ্ঠা নং-১২৪

১৫৩. তদেব। পৃষ্ঠা নং-১২৪

১৫৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, আয়না বিবির পালা, পৃষ্ঠা নং-৩০৬

১৫৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কাঞ্চন কন্যা পালা, পৃষ্ঠা নং-৪৯

১৫৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, রাজকন্যা রূপবতী পালা, পৃষ্ঠা নং-১৫০

১৫৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, দেওয়ান মদিনা পালা, পৃষ্ঠা নং-২৯৫

১৫৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, আমিনা বিবি ও নছর মালুম পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৩৭

১৫৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৩৪৫

১৬০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, মনির ওঝা ও মঞ্জুর মাও পালা, পৃষ্ঠা নং-৪০৪

১৬১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, লীলা কন্যা কবি কঙ্কপালা, পৃষ্ঠা নং-৩২

১৬২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, ভেলুয়া সুন্দরী-আমির সাধুর পালা, পৃষ্ঠা নং-১২৯

১৬৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কমলা কন্যা পালা, পৃষ্ঠা নং-১৮৪

১৬৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং-২১৪

১৬৫. তদেব। পৃষ্ঠা নং-২৪৬

১৬৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, শীলা দেবীর পালা, পৃষ্ঠা নং-৪৩৩

১৬৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই পালা, পৃষ্ঠা নং-৭৬

১৬৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং-১৩৬

১৬৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, মানিকতারা ডাকাইত পালা, পৃষ্ঠা নং-২৬১

১৭০. তদেব। পৃষ্ঠা নং-২৬৪

১৭১. তদেব। পৃষ্ঠা নং-২৬৮-২৬৯

১৭২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, নেজাম ডাকাইত পীরের কেরামতি পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৩১

১৭৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৩, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, পরীবাণু বেগমের পালা, পৃষ্ঠা নং-২১৯

১৭৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৩, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কবরের কান্না পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৫৫

১৭৫. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৩৬১-৩৬২

১৭৬. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৩৭৩

১৭৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, বাইন্যা বউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি পালা, পৃষ্ঠা নং-১৮৬

১৭৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং-১৮৭

১৭৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং-১৮৮

১৮০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, হাতি খেদার গান পালা, পৃষ্ঠা নং-৩১৬

১৮১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৬১

১৮২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, দেওয়ান ঈশা খাঁ পালা, পৃষ্ঠা নং-২০৫

১৮৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, বাইদ্যা কন্যা মহুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং -৯

১৮৪. তদেব।পৃষ্ঠা নং - ৩৩

১৮৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, আয়না বিবির পালা, পৃষ্ঠা নং-৩১৭

১৮৬. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩২০

১৮৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, শ্যাম রায়ের পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৪২

১৮৮. তদেব ।পৃষ্ঠা নং - ৩৫৮

১৮৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কাঞ্চনকন্যা পালা, পৃষ্ঠা নং-৭

১৯০. তদেব। পৃষ্ঠা নং-২৮

১৯১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কমলা রানীর পালা, পৃষ্ঠা নং-৭৫

১৯২. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৭৯

১৯৩. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৭৯

১৯৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, রাজকন্যা রূপবতী পালা, পৃষ্ঠা নং-১৫০

১৯৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, পীরবাতাসী কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং-১৭৫

১৯৬. তদেব। পৃষ্ঠা নং -২০০

১৯৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, আমিনা বিবি-নছর মালুম পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৪৬

১৯৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং -৩৫৯

১৯৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং -৩৭৩

২০০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, লীলা কন্যা কবি কঙ্ক পালা, পৃষ্ঠা নং-৮৩

২০১. তদেব। পৃষ্ঠা নং -৮৩

২০২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কমলা কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং-১৭৯

২০৩। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কাফেন চোরা পালা, পৃষ্ঠা নং-২৬০

২০৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং -২৬১

২০৫. তদেব। পৃষ্ঠা নং -২৬১

২০৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৮৭

২০৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, শীল দেবীর পালা, পৃষ্ঠা নং-৪০৩

২০৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই পালা, পৃষ্ঠা নং-১১২

২০৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং -১৭৫

২১০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, ভরার মেয়ের গান পালা, পৃষ্ঠা নং-২০৮

২১১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, মানিকতারা ডাকাইতের পালা, পৃষ্ঠা নং-২৪০

২১২. তদেব। পৃষ্ঠা নং -২৪২

২১৩. তদেব। পৃষ্ঠা নং -২৪৫

২১৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, শান্তি কন্যার হাঁহলা পালা, পৃষ্ঠা নং-৪০৩

২১৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৩, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কমল সদাইগরের পালা, পৃষ্ঠা নং-৪৩

২১৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৩, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, পরীবানু বেগমের পালা, পৃষ্ঠা নং-২১৯

২১৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং -২২০

২১৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৩, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, ছুরত জামাল-অধুয়া সুন্দরী পালা, পৃষ্ঠা নং-২৭৬

২১৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৩, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কবরের কান্না পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৪৬

২২০. তদেব। পৃষ্ঠা নং -৩৫৮

২২১. তদেব। পৃষ্ঠা নং -৩৬৬

২২২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৩, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, বারোতীর্থের গান পালা, পৃষ্ঠা নং-৪০০

২২৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা, পৃষ্ঠা নং-১২১

২২৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং -১৬০

২২৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, হাতি খেদার গান পালা, পৃষ্ঠা নং-৩০১

২২৬. তদেব। পৃষ্ঠা নং -৩০৫

২২৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং -৩০৮

২২৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং -৩২৪

২২৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৭২

২৩০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, হরিণ কুমার জিরালনী কন্যার পালা, পৃষ্ঠা

নং-৯২

২৩১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সন্নমালার পালা, পৃষ্ঠা নং-১২৬

২৩২. তদেব। পৃষ্ঠা নং -১৩২

২৩৩. তদেব। পৃষ্ঠা নং -১৪৫

২৩৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, রাজা রঘুর পালা, পৃষ্ঠা নং-২৭০

২৩৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ পালা, পৃষ্ঠা নং-২৯০

২৩৬. তদেব। পৃষ্ঠা নং -২৯২

২৩৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, বাইদ্যা কন্যা মহুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং -১৫

২৩৮. তদেব।পৃষ্ঠা নং - ৩২

২৩৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সুন্দরী মলুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং -১৩৭

২৪০. তদেব।পৃষ্ঠা নং - ১৬২

২৪১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, চন্দ্রাবতী পালা, পৃষ্ঠা নং -২২৯

২৪২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কেনা ডাকাতের পালা, পৃষ্ঠা নং -২৬৪

২৪৩. তদেব।পৃষ্ঠা নং - ২৮০

২৪৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, শ্যামরায়ের পালা, পৃষ্ঠা নং -৩৬১

২৪৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কাঞ্চন কন্যা পালা, পৃষ্ঠা নং -৭

২৪৬. তদেব।পৃষ্ঠা নং - ৪২

২৪৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, রাজকন্যা রূপবতী পালা, পৃষ্ঠা নং -১৬১

২৪৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, পীর বাতাসী কন্যার পালা পৃষ্ঠা নং -১৮২

২৪৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সদাগর কন্যা বগুলা পালা, পৃষ্ঠা নং -২১৭.

২৫০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, দেওয়ান মদিনা পালা, পৃষ্ঠা নং -২৭৭

২৫১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, মনির ওঝা মঞ্জুর মাও পালা, পৃষ্ঠা নং -৪০১

২৫২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, লীলা কন্যাকবি কঙ্ক পালা, পৃষ্ঠা নং -৮৩

২৫৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, ভেলুয়া সুন্দরী - আমির সাধু পালা, পৃষ্ঠা নং - ১০৭

২৫৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৫৪

২৫৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কমলা কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং -২৫০

২৫৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী পালা, পৃষ্ঠা নং -৩৫৩

২৫৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, শীলা দেবীর পালা, পৃষ্ঠা নং -৪৩৩

২৫৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪থ' খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই পালা, পৃষ্ঠা নং -২১

২৫৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৫৭

২৬০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, মইষাল বন্ধু - সাঁজুতি কন্যা পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৫২

২৬১. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৮৩

২৬২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৩, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, আন্ধা বন্ধুর বাঁশি পালা, পৃষ্ঠা নং -৯১

২৬৩. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১০৫

২৬৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৩, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কবরের কান্না পালা, পৃষ্ঠা নং -৩৭৩

২৬৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৬৯

২৬৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, হাতিখেদার গান, পৃষ্ঠা নং - ৩২৮

২৬৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পালা,পৃষ্ঠা নং - ৩৫৮

২৬৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, রতন ঠাকুরের পালা, পৃষ্ঠা নং - ১১

২৬৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সন্নমালার পালা, পৃষ্ঠা নং - ১২৪

২৭০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, দেবী চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩০২

২৭১. ড. দুলাল চৌধুরী ও ড. পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাদিত) – লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ (নব সংযোজন), প্রথম প্রকাশ-২০০৪, দ্বিতীয় সংযোজন - ২০১৩, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং - ৪৬২

২৭২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, বাইদ্যা কন্যা মহুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং -৪৭

২৭৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সুন্দরী মলুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং - ৯৯

২৭৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৬২

২৭৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, চন্দ্রাবতী পালা, পৃষ্ঠা নং - ২২৬

২৭৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কেনা ডাকাতের পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৫২

২৭৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ২৫৫

২৭৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১,

ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কাঞ্চন কন্যা পালা, পৃষ্ঠা নং - ৬০

২৭৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কমলা রানীর পালা, পৃষ্ঠা নং - ৭৬

২৮০. তদেব। পৃষ্ঠা নং-৮১

২৮১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সদাগর কন্যা বগুলা পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৩৫

২৮২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, আমিনা বিবি-নছর মালুম পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৫৮

২৮৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, লীলা কন্যা কবি কঙ্ক পালা, পৃষ্ঠা নং-৩৭

২৮৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং -৪৮

২৮৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা, পৃষ্ঠা নং-১১১

২৮৬. তদেব। পৃষ্ঠা নং -১১৩

২৮৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কমলা কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং-২১১

২৮৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং -২২৪

২৮৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং -২৫১

২৯০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সুনাই সুন্দরী পালা, পৃষ্ঠা নং-৩২৬

২৯১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াইপালা, পৃষ্ঠা নং-১৩২

২৯২ তদেব। পৃষ্ঠা নং -১৭৪

২৯৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, মানিকতারা ডাকাইত পালা, পৃষ্ঠা নং-২৫০

২৯৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, মইষাল বন্ধু সাঁজুতি কন্যার পালা, পৃষ্ঠা

নং-৩৫৩

২৯৫. তদেব। পৃষ্ঠা নং -৩৫৫

২৯৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৩, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কমল সদাইগরের পালা, পৃষ্ঠা নং- ৯-১০

২৯৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং -১০

২৯৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং -২৬

২৯৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৩, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, ছুরত্ জামাল-অধুয়া সুন্দরী পালা, পৃষ্ঠা নং-৩২৭

৩০০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৩, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কবরের কান্না, পৃষ্ঠা নং-৩৪০

৩০১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা, পৃষ্ঠা নং-৮২

৩০২. তদেব। পৃষ্ঠা নং -৮৩

৩০৩. তদেব। পৃষ্ঠা নং -৮৭

৩০৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, বাইন্যা বউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি পালা, পৃষ্ঠা নং-১৮৬

৩০৫. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ২১৭

৩০৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সন্নমালার পালা, পৃষ্ঠা নং-১৩৮

৩০৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ পালা, পৃষ্ঠা নং-৩০৪

৩০৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং -৩১৮

৩০৯. দুলাল চৌধুরী - চাক্মা প্রবাদ, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর - ১৯৮০, পুস্তক বিপণি, কলি - ০৯, পৃষ্ঠা নং - ১৮।

৩১০ বরুণ কুমার চক্রবর্তী - বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল - ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি,

কলি - ০৯, পৃষ্ঠা নং - ১৬৮।

৩১১. আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলার লোকসাহিত্য (প্রথম খণ্ড), তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬২। সংগৃহীত - ড. দুলাল চৌধুরী, চাক্‌মা প্রবাদ, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর - ১৯৮০, পুস্তক বিপণি, কলি - ৯, পৃষ্ঠা নং - ১৫

৩১২. ড. পল্লব সেনগুপ্ত - লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি, কলি - ৯, পৃষ্ঠা নং - ১৫১।

৩১৩. সুশীল কুমার দে - বাংলা প্রবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৩৫৯, কলিকাতা, পৃষ্ঠা নং - ৩, ৪।

৩১৪. ড. দুলাল চৌধুরী - চাক্‌মা প্রবাদ, প্রথম সংস্করণ - সেপ্টেম্বর, ১৯৪০, পুস্তক বিপণি, কলি - ৯, পৃষ্ঠা নং - ১৬।

৩১৫. সুশীল কুমার দে - বাংলা প্রবাদ, দ্বিতীয সংস্করণ, ১৩৫৯, কলিকাতা, পৃষ্ঠা নং - ৫।

৩১৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ- ১৯৭০, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালা, পৃষ্ঠা নং - ৯।

৩১৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ২৯।

৩১৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৪।

৩১৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ- ১৯৭০, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, 'সুন্দরী মলুয়া' পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৪৫।

৩২০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ- ১৯৭০, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, শ্যামরায়ের পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৪৮।

৩২১. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৪৮।

৩২২. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৫৫।

৩২৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কাঞ্চনকন্যা পালা, পৃষ্ঠা নং - ১০।

৩২৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ২১।

৩২৫. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৫৭।

৩২৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কমলা রানী পালা, পৃষ্ঠা নং - ৮০।

৩২৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৮০।

৩২৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, পীরবাতাসী কন্যা পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৮২।

৩২৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, সদাগর কন্যা বগুলা পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৩৪।

৩৩০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, দেওয়ান মদিনা পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৫৯।

৩৩১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, আমিনা বিবি নছর মালুম পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩২৭।

৩৩২. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৩৫।

৩৩৩. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৪২।

৩৩৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৭০।

৩৩৫. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৬৭।

৩৩৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৬।

৩৩৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৭।

৩৩৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ২৮।

৩৩৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৫।

৩৪০. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৬।

৩৪১. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৪০।

৩৪২. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৪১।

৩৪৩. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৬০।

৩৪৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধু পালা, পৃষ্ঠা নং - ১১৭।

৩৪৫. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৩২।

৩৪৬. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৫০।

৩৪৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৬১।

৩৪৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কমলা কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৮৮।

৩৪৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৯৯।

৩৫০. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৯৯।

৩৫১. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৯৯।

৩৫২. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ২৪৯।

৩৫৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, সুনাই সুন্দরী পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩০২।

৩৫৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩০৪।

৩৫৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৮৭।

৩৫৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, শীলাদেবীর পালা, পৃষ্ঠা নং - ৪১৮।

৩৫৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭২। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, রঙ্গমালা সুন্দরী পালা, পৃষ্ঠা নং - ৪৪।

৩৫৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১০।

৩৫৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৫৫।

৩৬০. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৬৭।

৩৬১. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১২১।

৩৬২ তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১২৩।

৩৬৩ তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৩৫।

৩৬৪ তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৬৫।

৩৬৫ তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৭৯।

৩৬৬ ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭২। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, মানিকতারা ডাকাইত পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৬৫।

৩৬৭ ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭২। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, মইষাল বন্ধু সাঁজুতি কন্যা পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৫০।

৩৬৮ তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৫৭।

৩৬৯ ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কমল সদাইগর পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৩।

৩৭০ তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৫।

৩৭১ তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৭।

৩৭২ তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৭।

৩৭৩ তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৯।

৩৭৪ ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, আন্ধাবন্ধুর বাঁশি পালা, পৃষ্ঠা নং - ৯৪।

৩৭৫. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৮৪।

৩৭৬. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৯৮।

৩৭৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, পরীবাণু বেগমের পালা, পৃষ্ঠা নং - ১১৭।

৩৭৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, ছুরত জামাল - অধূয়া সুন্দরী পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৯৩।

৩৭৯ ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কবরের কান্না পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৪৮।

৩৮০ তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৭৯।

৩৮১ ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৪, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, ''কুমার বীরনারায়ণ পালা'', পৃষ্ঠা নং - ৩১।

৩৮২ তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৪।

৩৮৩ তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৪৬।

৩৮৪ তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৪৯।

৩৮৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৪,। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, ভেলুয়া সুন্দরী মদন সাধুর পালা, পৃষ্ঠা নং - ৮৭।

৩৮৬. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১২৬।

৩৮৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১২৭।

৩৮৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৩৬।

৩৮৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৩৯।

৩৯০. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৫৬।

৩৯১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৪,। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, বাইন্যা বউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৯২।

৩৯২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৪,। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, মলয়া কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৭৮।

৩৯৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৪,। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, হাতি খেদার গান পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩১৩।

৩৯৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৪। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৮২।

৩৯৫. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩৮৬।

৩৯৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৫, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, হরিণ কুমার জিরালনী কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং - ৪৯।

৩৯৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৬৩।

৩৯৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৫, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, সন্নমালা পালা, পৃষ্ঠা নং - ১১৫।

৩৯৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৩০।

৪০০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৫, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, দেওয়ান ঈশা খাঁ পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৯৮।

৪০১. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ২০৪।

৪০২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) — প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৫, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কবি চন্দ্রাবতী দেবী রচিত রামায়ণ পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৯০।

৪০৩. তদেব।পৃষ্ঠা নং - ৩১৪।

৪০৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৩২৫।

৪০৫. পল্লব সেনগুপ্ত – লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি, কালি-৯, পৃষ্ঠা নং-৭৫

৪০৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (১ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সুন্দরী মলুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৩৭

৪০৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং -১৩৮

৪০৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং -১৩৮

৪০৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (১ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, চন্দ্রাবতী পালা, পৃষ্ঠা নং - ২২৬

৪১০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (১ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭০, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কেনা ডাকাতের পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৫৫

৪১১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (২য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কমলা রানীর পালা, পৃষ্ঠা নং - ৭৫

৪১২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (২য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, রাজকন্যা রূপবতী পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৬৪

৪১৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (২য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সদাগর কন্যা বগুলা পালা, পৃষ্ঠা নং - ২২৭

৪১৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং -২৪৬

৪১৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (২য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, দেওয়ান মদিনা পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩০৪

৪১৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (৩য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, লীলা কন্যা কবি কঙ্ক পালা, পৃষ্ঠা নং - ৯৮

৪১৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (৩য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, ভেলুয়া সুন্দরী-আমির সাধুর পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৩০

৪১৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (৩য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কমলা কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৪৬

৪১৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং -২৫৩

৪২০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (৩য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭১, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, শীলা দেবীর পালা, পৃষ্ঠা নং - ৪৩২

৪২১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই পালা, পৃষ্ঠা নং - ৫২

৪২২. তদেব। পৃষ্ঠা নং -১২৫

৪২৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, ভরার মেয়ের গান পালা, পৃষ্ঠা নং - ২২৫

৪২৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭২, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, মানিকতারা ডাকাইত পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৭২

৪২৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (৫ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭৩, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কমল সদাইগরের পালা, পৃষ্ঠা নং - (৯-১০)

৪২৬. তদেব। পৃষ্ঠা নং -১০

৪২৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং -১৬

৪২৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (৬ষষ্ঠ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৪৮

৪২৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (৬ষষ্ঠ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, বাইন্যা বউলক্ষ্মীর ঝাঁপি পালা, পৃষ্ঠা নং - ২১৬

৪৩০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (৬ষষ্ঠ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭৪, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পালা, পৃষ্ঠা নং - ৪০০

৪৩১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (৭ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, হরিণ-কুমার জিরালনী কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং - ৬৫

৪৩২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (৭ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, সন্নমালার পালা, পৃষ্ঠা নং - ১১৬

৪৩৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) – প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা (৭ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭৫, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা-১২, কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ পালা , পৃষ্ঠা নং - ২৯৫

———